জেল ও জহ্লাদ

বেদুইন

পূর্বাচল
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯

Jail-O-Jalha
Bedouin

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬১

মুদ্রাকর :—
শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের অন্যতমা নেত্রী

শ্রীমতী শুক্লা দাঁ

অনুজা প্রতিমেষু

ইন্দিরা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বেদুইন-এর "স্মাগলিং চক্র"র বাজেয়াপ্তের আদেশ বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত হওয়ায় শীঘ্রই বইটি পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবাদ আছে, রাজনীতিবিদ্, শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অবসর গ্রহণ করার পর আত্মকথা অর্থাৎ অটোবায়োগ্রাফি লেখেন অবসর সময়ে। আমি জানি, অবশ্য সবাই জানেন, এইসব আত্মকথার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ অসত্য আর আত্মপ্রশংসা। আমিও কয়েক বছর ধরে আত্মকথা লেখার চিন্তা করছি। অফুরন্ত আমার অবসর, এর সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছা মাঝে মাঝেই আমার মনে দোয়াত কলমের নেশা জাগায়। অথচ কেন বা এগোতে পারছিনা।

গম্ভীরভাবে নকুলকাকা কথা কয়টি শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

নকুলকাকা খ্যাতনামা ব্যক্তি। সবাই তাঁকে চেনেন নোকুলোবাবু নামে। প্রায় কেশহীন বর্তুলাকার মাথার পাশে কয়েকগুচ্ছ শুভ্রকেশ ও দন্তহীন মুখগহ্বর দেখলেই বয়সটা আন্দাজ করা যায় কিন্তু সুঠাম পেশীবহুল দেহটি বোধহয় বয়সের অসহযোগিতাকে ব্যঙ্গ করেই থাকে। গৌরবর্ণ দেহটি যখন ইজি চেয়ারে এলিয়ে দেন তখন কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয় উপস্থিত অনেকের মনে। নকুলকাকা সবার চোখে একজন হিরো,, তাঁর অতীত হল ত্যাগ তিতিক্ষার অপূর্ব অনুকরণযোগ্য আদর্শ।

নকুলকাকা চায়ের কাপটি সযতনে নামিয়ে রাখতেই অনিমেষ আগ্রহ সহকারে বলল, আপনি একটি আত্মকথা লিখুন কাকা, আমি ছেপে বের করার দায়িত্ব নেব।

নকুলকাকা হেসে বললেন, ছাপানোটা যতটা সহজ, লেখাটা অত সহজ নয় বাপধন।

তা সত্যি। আপনি লিখুন। দরকার হলে আপনি বলবেন আমি লিখে নেব।

সাবাস্। কিন্তু আমার আত্মকথার সেন্ট্ পারসেন্ট্ মিথ্যাও হতে পারে আবার সেন্ট্ পারসেন্ট সত্যও হতে পারে। মিথ্যাটা লিখলে কাটতি হবে গরম পিঠের মত, যাকে তোমরা বল, হট্ কেক্। আর সত্যটা লিখলে অচিরে অনিমেষ ঘোষের কারাবাসের পথ খুলে যাবে, আর বৃদ্ধ বয়সে আমাকেও সহগামী হতে হবে। তাই ভাবছি লিখব কি লিখব না। নিজেকেও যেমন বিব্রত করতে চাইনা, তেমনি চাইনা অপরকে।

নকুলকাকার কথায় বাধা পড়ল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নকুলকাকার বিধবা পুত্রবধূ মেনকা মৃদুকণ্ঠে বলল, বাবা আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। নিয়ে আসব কি?

ওষুধের কথা শুনেই নকুলকাকা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আর ওষুধ খেতে ইচ্ছে হয়না বউমা, ওটা রেখে দাও।

মেনকা কিছু বলার আগেই শুকনো হাসিতে মুখ ভরিয়ে নকুল-কাকা আবার বললেন, তোমার সেই মামাতো বোনের সঙ্গে আজ সকালেই ট্রামে দেখা হয়েছিল।

মেনকার কণ্ঠে অনিচ্ছার স্বর শোনা গেল, কিছু বলেছে বুঝি?

না তেমন কিছু নয়। তোমার কথা বলছিল। বললাম, মেনকা মা ভালই আছে।

মেনকা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে বলল, সত্যিই ভাল আছি বাবা।

অনিমেষ অবাক হয়ে শুনছিল।

তাদের কথার মাঝে কোন কিছু বলা মোটেই অভিপ্রেত নয় এবং তা সভ্যসমাজে নিন্দিত। তবুও কিছু বলার জন্য উসখুস করছিল। অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, একটা কথা বলতে চাই কাকা। যদি অনুমতি দেন তা হলে বলতে পারি।

নকুলকাকা যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। আগ্রহ সহকারে বললেন, অবশ্যই বলতে পার।

অনিমেষ মৃদুস্বরে বলল, যারা আপনাদের মঙ্গল সংবাদ জানতে চায় তারা বোধহয় ব্যঙ্গ করতে চায়। এই সব শুকনো সহানুভূতি অপমানেরই নামান্তর।

হো-হো করে হেসে উঠলেন নকুলকাকা। একটানা অনেকক্ষণ হেসে থামলেন।

এটা তো হাসির কথা নয়।

অবশ্যই নয়। তবে ব্যঙ্গ কেন তুমি মনে করছ তা ভেবে পাচ্ছি না। ওরা সহানুভূতি জানাবার মন নিয়েই মঙ্গল সংবাদ জানতে চায়। ওরা মানে যারা আমাদের সংবাদ জানতে চায় তারা সত্যিই আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

অনিমেষ গম্ভীরভাবে বলল, হিতাকাঙ্ক্ষীর পোষাকেই তো পুলিশ এসেছিল আপনার বাড়িতে। বিশেষ সম্মান দেখিয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছিল, সতুদাকে থানায় পাঠিয়ে দিতে? উদ্দেশ্যও তাদের মহৎ ছিল। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারপর সেই হিতাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আপনার বোধহয় আর দেখা হয়নি। যে হিত সাধন করেছে শান্তির অগ্রদূতরা তা বোধহয় সারা জীবনে বিস্মৃত হবার কোন অবকাশ আপনি পাবেন না।

মেনকা বাধা দিয়ে বলল, এসব আলোচনা নিরর্থক।

না না বউমা, অনিমেষকে বলতে দাও। আগে মাঝে মাঝে ওকে ঠাট্টা করে বলতাম, তোমার নামের 'অনি'-টা বাদ দিয়ে 'মেষ'-টাই তোমার যোগ্য। তখন মনে করতাম অনিমেষ এমন একজন যুবক যার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, পরবর্তীকালে দেখেছি ওর বাস্তববুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক প্রখর। পুলিশ তো সতুকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছিল, সেই সুযোগ সে যদি নিত তাহলে, বলেই বৃদ্ধ নকুলকাকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

মেনকা ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি কাঁদছেন বাবা !

জামার হাতায় চোখ মুছে বলল, না রে মা, না। বুঝলে অনিমেষ। আমি কিন্তু মোটেই পুলিশকে দোষ দেই না।

কেন ?

পুলিশ যা করেছে তার দায়িত্ব পুলিশের নয়। যাদের দায়িত্ব তারা নেপথ্যে বসে আজও কলকাঠি নাড়ছে। তোমার বোধহয় মনে আছে, প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে গুরুতর ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার পরিণতি আমরা অসহায় লোকের দল আজও সহ্য করছি। আরও কতকাল সহ্য করতে হবে কে জানে !

আজ ওসব আলোচনা বন্ধ করুন। এতে আপনি ব্যথা পান। এই ব্যথাকে চাঙ্গা করে লাভ কি বাবা।

ব্যথা যতই মনের কোনে গুমরে ফিরবে, ততই শ্বাসরোধকারী হবে। অভিব্যক্তি না থাকলে জলে ডোবা মানুষের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের জ্ঞাতসারেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। তার চেয়ে যতই নিজের কথা বলব, যতই অপর ঘটনার সঙ্গে নিজের অবস্থাকে তুলনা করব ততই আয়ুবৃদ্ধি পাবে।

আয়ুবৃদ্ধিতে দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে কাকা।

ঠিক বলেছ অনিমেষ। কিন্তু পাপের তরী পূর্ণ না হলে তো ভরাডুবি হয় না। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে প্রশাসকদের পাপের ভরাডুবির দিন অবধি। এর আগে তো মরতে পারছি না, মরতে চাইনা।

মেনকা মৃদুস্বরে বলল, কথা বলার অধিকারটুকুও তো আমরা হারিয়েছি।

এটা যে হবে তা বুঝতে পেরেছিলাম সেই দিন যেদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, I will fight to finish, কিন্তু বউমা পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই চিরস্থায়ী হয় না। কোন অসত্যই দৃঢ়মূল হয় না। যারা অপরকে finish করার চিন্তা করে তারা নিজের অজ্ঞাতে নিজেকে finish করার পথ উন্মুক্ত করে। সাধারণ মানুষের জীবনে দেখা যায়

একটা প্রাপ্তি আরেকটা অধিকতর লোভনীয় প্রাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই পাওয়ার নেশা কাকে বঞ্চিত করল, কাকে পদদলিত করল তা ভেবে দেখার সে অবসর পায় না এই সব নেশাগ্রস্ত মানুষ। যদি কেউ কোন হিতোপদেশ দেয় অথবা দিতে চেষ্টা করে তাকে মনে করে শত্রু। এরা ভুলে যায় এক অথবা একাধিক 'finished' মানুষ তৈরী করে শত শত finish-পন্থী মানুষ। একটা নরহত্যা যদি সমাজ জীবনের শেষ ঘটনা হত তা হলে তার আঘাত বাতাসে মিলিয়ে যেত সহজেই কিন্তু তা শেষ ঘটনা নয় বলেই একটি নরহত্যা শত শত নরহত্যাকারী সৃষ্টির পথ খুলে দেয়। একটি পাপীর পাপ সমাজদেহে এমন ক্ষত সৃষ্টি করে যাতে শত শত পাপীর আবির্ভাব ঘটে।

মেনকা ফেরবার উপক্রম করতেই নকুলকাকা বললেন, আজ রাতে অনিমেষ এখানেই খাবে।

মাথা ঝুঁকিয়ে মেনকা এগিয়ে যেতেই অনিমেষ বলল, না দিদি, আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। জোর তাগাদা দিয়েছেন স্বয়ং গৃহ-কর্ত্রী। খেয়ে যেতে হলে অনেক রাত হয়ে যাবে।

খুব দেরী হবে না অনিমেষ, এক ঘণ্টার মধ্যে সব হয়ে যাবে। তুমি ততক্ষণ বাবার সঙ্গে গল্প কর। বাবা আপনি বরং অনিমেষকে আপনার বন্দীজীবনের মজার মজার ঘটনাগুলো বলুন। আজকের দিনের মানুষ আমরা, আমরা যা দেখছি, সহ্য করছি তার সঙ্গে সেদিনের পার্থক্যটা আমরা বেশি করে দেখতে চাই।

মেনকা রান্নাঘরের দিকে গেল।

নকুলকাকা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, মেনকা মা যাতে ব্যথা না পায় তাই করি অনিমেষ। তার কোন কাজেই বাধা দেই না, শুধুমাত্র তার বিধবার পোষাকটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমি আজও তাকে রঙ্গীন শাড়ী পরতে দেই, আজও গহনা পরতে তাকে বাধ্য করি। শুধুমাত্র তার মাথায় সিঁদুর দিতে কোন অনুরোধ করি না।

অনিমেষ বলল, সতুদার মৃত্যু তো অনুমান। কোন প্রমাণ তো আজও আপনি পান নি কাকা।

অস্থিরভাবে নকুলকাকা বললেন, সতু মরেনি অনিমেষ, তাকে মেরে গুম করেছে।

আপনি নিশ্চিত?

অবশ্যই। সতুর মত ছেলে হারিয়ে যায় না অনিমেষ। আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম থানায়। সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছে। বললাম, তোমাকে থানায় যেতে হবে সতু। বড়বাবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সতু জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে কেন ডেকেছে তা কি জানো?

বলেছিলাম, সে সব কিছুই জানি না। তারা কোন খবর জানতে চায়।

আমি কি খবর দিতে পারি?

কি করে জানব।

সতু কোন চিন্তা না করে এক কাপ চা খেয়েই বেরিয়ে গেল। তারপর সে আর ফিরে আসেনি। দিনের পর দিন কেটে গেছে, মাসের পর মাস কেটেছে, বছরের পর বছর কেটে গেছে।

আপনি থানায় গিয়েছিলেন কি কাকা?

রাত দশটা অবধি যখন সে ফিরল না তখন নিজেই গেলাম থানায়। আশ্চর্য কথা! পুলিশ বলল, সত্যনাথ রায় নামে কোন লোক থানায় আসেই নি।

বললাম, সে কি! আপনারা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অফিস থেকে ফিরে আসতেই তাকে যেমন বললাম ওমনি সে অফিসের কাপড়-চোপড় নিয়েই বেরিয়ে এসেছে।

বড়বাবু বলল, আমরা তাকে ডেকে পাঠাইনি। আপনি ভুল করছেন।

আমি বললাম, এত বড় ভুল আমি করতেই পারি না। আপনি বলুন আমার ছেলে কোথায়?

বড়বাবু ক্রুদ্ধভাবে বলল, অনর্থক কথা বাড়াচ্ছেন। আপনার ছেলে কোন বদলোকের পাল্লায় পড়েছে নিশ্চয়ই। বাড়ি যান।. এতক্ষণে হয়ত সে ফিরে এসেছে। একটা মিসিং ডায়েরী করে যেতে পারেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। একটা ডায়েরী দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। সারারাত কেটে গেল অনিদ্রায়। মেনকা মা সারারাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সকাল হতেই আবার গেলাম থানায়। .না, কোন সংবাদ নেই। বাইরে এসে একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, কি করা উচিত। এমন সময় পুলিশের শব সৎকারের কালো গাড়িটা এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে মৃতদেহটা তারা গাড়িতে তুলল তার মুখ ঢাকা থাকলেও তার পরণের প্যাণ্ট দেখে মনে হল, ওটাই আমার সতু। আমি ছুটে যাবার আগেই গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল। এরপর আর প্রমাণ দরকার ছিল না অনিমেষ।

কথা বলতে বলতে নকুলকাকার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

অনিমেষ বৃদ্ধের মুখের চেহারা দেখে শঙ্কিত হল।

অনিমেষ নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল নকুলকাকা ভেতরে ভেতরে অত্যধিক উত্তেজিত হয়েছেন। প্রসঙ্গ চাপা দেবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি দিদির রান্নার কত দেরি।

নকুলকাকা বাধা দিয়ে বললেন, বস, বস। রান্না হলেই তোমার দিদি তোমাকে ডাকতে আসবে। অত ব্যস্ত কেন? শুনতে ভাল লাগছে না, তা তো হবেই। জান অনিমেষ, তিরিশ সাল থেকে পঁয়তাল্লিশ সালের মধ্যে আট বছর জেলে কাটিয়েছি। কিন্তু ইংরেজ যতই দুর্জন হোক, কখনও বিচার না করে কারও প্রাণ হরণ করত না। কিন্তু স্বদেশী রাজার শাসনে বিচার ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে গেছে। আমাকে আন্তঃপ্রাদেশিক মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল। বিচার হয়েছিল ট্রাইবুন্যালে। বিচারে খালাস পেলাম। জেলের গেটে আবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

নকুলকাকা থামলেন, ডাকলেন মেনকাকে।

কই বউমা, তোমার হেঁসেলের খবর এখনও পাচ্ছি না কেন?

রান্নাঘর থেকে মেনকা জবাব দিল, এত তাড়াতাড়ি কি হয়। আরও আধঘণ্টা দেরী হবে। অনিমেষ যেন পালিয়ে না যায়।

শুনলে তো বাবা, তোমার দিদি একদম নড়নচড়ন নট্ করে দিল। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। ছোট বেলায় আমরাও ব্যস্ত হতাম, ব্যস্ত হলেই কর্মপণ্ড, একটু ধীরে সুস্থে কাজ করলে কাজটাও ভাল হয়, মনেও তৃপ্তি আসে। তারপর যা বলছিলাম, সেই যে জেল গেটে গ্রেপ্তার করল, তারপর নিয়ে গেল বহরমপুর ক্যাম্পে। একটা কথা জান কি বাপু, তখনকার দিনে গ্রেপ্তার করলে, জেল জুলুমের ভয় থাকলেও গুম হবার ভয় ছিল না। এখন যেমন পাইকারী হারে মানুষ মারছে ওরা তখন বিদেশী শাসকরা তা করত না।

অনিমেষ বলল, এটা ঠিক নয়। ইংরেজ সরকারও পাখতুনদের উপর বিমান থেকে বোমা ছুড়ে বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিশেষত্বই হল বিপক্ষকে হত্যা করা, বিপক্ষদের ওপর জুলুম করা। এটাই তো সনাতন রীতি।

ঠিক বলেছ অনিমেষ। তবুও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের কিছুটা সভ্য চেহারা ছিল। এদের সেই সভ্য রূপটাও নেই। প্রধানমন্ত্রী বললেন, fight to finish, অমনি তার স্তাবকরা বাহোবা দিল, বরকন্দাজরা হাতিয়ার নিয়ে নেমে পড়ল finish করতে। এ রকমটা ইংরেজ রাজত্বে কখনও হয় নি। হিজলী বন্দী নিবাসে পুলিশের গুলিতে দুজন মারা যেতেই সারা ভারতে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। বন্দী হত্যার প্রতিবাদ জানাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ভঙ্গী ভীত করেছিল ইংরেজ সরকারকে। জালিওয়ানাবাগে নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষদের খুন করেছিল ইংরেজ। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ইংরেজদত্ত 'স্যার' খেতাব বর্জন করেছিলেন। অথচ আমার সত্যনাথের মত হাজার হাজার জওয়ান ছেলেকে হত্যা করেছে স্বদেশী সরকার। প্রতিকার প্রার্থনা দূরের কথা মৃদু প্রতিবাদ করার সাহসও ছিল না একজনেরও। রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ কাপুরুষ ও নপুংসক এটা চিন্তা করাও যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট পুরুষ আমাদের দেশে জন্মেছিলেন এটা আমাদের সৌভাগ্য। আবার যখন দেখি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, কাপুরুষের মত অন্যায়কে মাথা পেতে নিচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ তখন মনে হয় কঠিন দুর্ভাগ্য না ঘটলে রবীন্দ্রনাথ কেন আমাদের দেশে জন্ম নেবেন!

বাবা।

কেন মেনকা মা।

খাবার প্রস্তুত। অনিমেষের সঙ্গে আপনার খাবার দেব কি?

তাই দাও। এখানেই জায়গা করে দাও। কি বল অনিমেষ? খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

মেনকা খাবার আনতে গেল।

নকুলকাকা বললেন, একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল জেলখানায়। সাধারণ কয়েদীরা ঠিক স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় না কোন জেলখানাতেই। কয়েদীরা অপুষ্টির লক্ষণ দেখা দিলেই ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হয়। কোন রকমে হাসপাতালে যেতে পারলে দুচার দিন মুখ বদলও হয়। ভাল খাবারও পাওয়া যায়।

মজাটা হোল একদিন সকালে।

আমি তখন রুগী। দুপাশে যে সব রুগী শুয়ে রয়েছে তারা অপরাধীজগতের বেশ নামকরা ব্যক্তি। এদের শতকরা আশী ভাগই হাসপাতালে এসেছে একটু ভাল খাবার পেতে। অর্থাৎ রুগী হলেও তারা রুগী নয়।

সকাল বেলায় রুগীরূপী দুই কয়েদীতে লড়াই বেধে গেছে।

পাহারা মেট ছুটে এল। ওয়ার্ডাররা লাঠি হাতে ছুটে এল কি ব্যাপার?

আজ্ঞে আমি রহিমুদ্দিন, পাশের বেডে আছি। আর শালা রামস্বরূপ আমার দুধের বাটিতে পিসাব করে দিয়েছে।

রামস্বরূপ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, ঝুটা বাত হামি পিসাব কিয়া, লেকিন হামি নেহি জানে উসমে দুধ থা।

অনেক আলোচনা, চিৎকার, ঝগড়ার পর জানা গেল, গত রাতে রহিমুদ্দিন হাসপাতালের কিচেন থেকে কিছুটা দুধ চুরি করে এনেছিল। দুধ রাখবার মত পাত্র না পেয়ে রুগীদের ইউরিন পট্ ধুয়ে তাতে রেখেছিল দুধটুকু সকালবেলায় চায়ের সঙ্গে খাবার আশায়। পট্‌টা লুকিয়ে রেখেছিল রামস্বরূপের বেডের তলায়। রাতের বেলায় রামস্বরূপ প্রস্রাব করতে বাথরুমে যাওয়ার আলস্যে হাতের কাছে পট পেয়ে তাতেই প্রস্রাব করেছে। সে জানত না ঐ পটে দুধ আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। গল্প শেষ করে নকুলকাকা হো-হো করে হাসতে থাকেন। তার হাসিতে কোন ভেজাল নেই। একেবারে প্রাণ খোলা হাসি।

মেনকা খাবারের থালা নিয়ে এল। খাবার সাজিয়ে দিল দুজনের সামনে। অনিমেষ মুখ তুলে দেখল মেনকার দিকে। একটা পাথরের মূর্তি নিখুঁতভাবে খোদাই করা। প্রশান্ত তার চেহারা, প্রশান্তি যেন আলপনা এঁকে দিয়েছে তার সর্বাঙ্গে।

অনিমেষকে লক্ষ্য করে বলল, বড়ই রাত হয়ে গেছে কি?

না মোটেই নয়। দিদিরা যদি ভাইদের জন্য কষ্ট করে হেঁসেলে বসতে পারেন, ভাইরা কেন পারবে না ধৈর্য ধারণ করতে সুখাদ্যের লোভে।

হাঁ, ঠিক বলেছ অনিমেষ। আমার সতুও বলত। মেনকা মা রন্ধনে একেবারে দ্রৌপদী।

কথা শেষ করেই নকুলকাকা মেনকার মুখের দিকে তাকিয়েই

থমকে গেলেন। বৃদ্ধ নকুলকাকা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন তাঁর এই স্তুতি তাঁর পুত্রবধুর কোন কোমল অনুভূতিতে কঠিন আঘাত করেছে। কথা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। নিরুপায়ে বোবার মত চেয়ে রইলো অনিমেষের দিকে। অনিমেষ অবস্থাটা বুঝে বলল, এ সব কষ্টদায়ক আলোচনা না করাই ভাল।

মেনকার ব্যথা হয়ত দুজনেই বুঝেছিল। মেনকা কিন্তু তার কথার মাঝ দিয়ে সামান্যতম দুঃখের অভিব্যক্তি জানাল না। মৃদুকণ্ঠে বলল, আলোচনা কেন করবে না ভাই। আলোচনায় সত্য মিথ্যা নির্ধারিত করা যায়। আলোচনা তো ঝগড়া নয়। আর কষ্টদায়ক কেন মনে করছ। আমার জীবনের এসব ঘটনা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে সমাজ জীবনে তা বলা কঠিন কিন্তু চোখের সামনে স্বামীকে হত্যা করেছে এমন ঘটনাতো বিরল নয়। রাজ্যশ্রী দাশগুপ্তার কথাই ভেবে দেখুন বাবা। পরিকল্পনা কেমন সুন্দর। পুলিশ তথা সরকার থেকে প্রচার করা হল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভাঙ্গতে গিয়েছিল দেড়গণ্ডা অমানুষ, তার মধ্যে একজন মহিলা। যারা এই গুরুতর ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছিল তাদের অস্ত্রমাত্র, একটি বোমা।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য নয় বাবা। আপনি তো আজকাল বাইরের জগতের খবর বেশি রাখেন না তাই আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। জেলখানার টাওয়ারে শান্ত্রী রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত ছিল। কয়েদীদের দর্শনপ্রার্থী সন্দেহজনক কয়েকজন বিরুদ্ধপন্থীকে জেল গেট থেকে তাড়া করল ওয়ার্ডাররা। তাদের সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়েও সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হল না, উপরন্তু তাদের কুকুরের মত লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দেওয়া হল রাস্তায়। টাওয়ারে তখন শান্ত্রীরা প্রস্তুত ছিল। তাদের উন্মুক্ত স্থানে দেখতে পেয়েই এলোপাথারী বেপরোয়া গুলি ছুড়তে থাকে শান্ত্রীরা নিশানা অব্যর্থ পথচারীসহ আঘাত

করল নির্দিষ্ট কয়েকজনকে। গুলিতে মারা গেল রণজয় দাশগুপ্ত, রাজ্যশ্রীর স্বামী। আহত হল রাজ্যশ্রী স্বয়ং। মুমূর্ষু রণজয় দাশগুপ্তকে টানতে টানতে নিয়ে গেল রাজ্যশ্রী রাস্তার ধারে। চলতি একটা প্রাইভেট গাড়ি থামিয়ে তাদের হাসপাতালে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানাল। গাড়ির আরোহী একজন মহিলা চিকিৎসক। দয়া পরবশ হয়ে তাদের পৌঁছে দিতে গাড়িতে তুলে নিলেন। গাড়ি হাসপাতালে পৌঁছানো দূরের কথা, কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘেরাও করল গাড়ি। মৃত রণজয় দাশগুপ্তকে মর্গে পাঠিয়ে রাজ্যশ্রীকে নিয়ে গেল হাজতে আর সেই দয়াময়ী মহিলা চিকিৎসক বন্দী হলেন তার মানবতাবোধের উচ্চাদর্শের জন্য।

মেনকা থেমে গেল।

নকুলকাকা ও অনিমেষ নীরবে ভোজন কার্য শেষ করতে ব্যস্ত। কেমন একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অনিমেষ বলল, তারপর?

তারপর মিথ্যা প্রচার চলল। ওরা নকশালপন্থী। ওরা জেল ভেঙ্গে নকশাল বন্দীদের বের করে আনতে গিয়েছিল। শত শত সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত আলিপুর জেলে অর্ধডজন যুবক যুবতী একটি মাত্র বোমা সম্বল করে জেল ভাঙ্গতে যাওয়াটা কতটা মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত তা সবাই জানে বোঝে কিন্তু সরকারী প্রশাসন নিজেদের নৃশংসতা মূঢ়তা ও মূর্খতাকে গোপন করতে বিশ্বজনকে মূর্খ মনে করে, এটাই হল সবচেয়ে বড় অবাকৃকাণ্ড। এরপরই পর্দার আড়ালে ঘটনা ঘটতে থাকে। সে সব ঘটনা হয়ত জানা যেত না।

অনিমেষ খাওয়া শেষ করে মুখ ধুতে যেতেই মেনকা কথা বন্ধ করে এঁটো থালা তুলতে ব্যস্ত হল। নকুলকাকাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার যে কত কি মনে থাকে, হায় ভগবান!

সব ঘটনা কি মনে থাকে বাবা। যে সব ঘটনা নেহাত বুকের মাঝে আঁচড় কেটে বসে সে সব ঘটনাই মনে থাকে। একটা মানুষের

জীবনে সারা দিনে কত না ঘটনা ঘটে। কত ঘটনার মাঝ দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয় সামান্য একদিনে। পরের দিন সব ঘটনার কতটুকু আমাদের মনে থাকে, মনে থাকে কিছু বিশেষ বিশেষ ঘটনা যা মনে দাগ কেটে বসে। যখনই আমার মনে হয়, আপনার ছেলেকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তখনই মনে পড়ে রাজ্যশ্রীর কথা। তার প্রতি কতটা নৃশংস আচরণ করা হয়েছে তাতো জানা যায়নি বহুকাল।

অনিমেষ হাত মুখ ধুয়ে যথাস্থানে বসতেই মেনকা বলল, এবার তোমাকে ছুটি দিলাম ভাই। করবী দেবী দেখলে আমার ওপরই চটে যাবে। দেখা হলে হয়ত কথাই বলবে না।

না দিদি তা হবে না। করবী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে আপনার প্রতি। আপনার ব্যথা বেদনাকে সে নিজের ব্যথা বেদনা বলেই মনে করে। অনেক সময় আপনার কথা বলতে বলতে কেঁদে উঠে।

মেনকা শুধু হাসল।

হাসছো কেন দিদি?

আমার ব্যথা বেদনা যে অপরকে ব্যথিত করে তা সত্যি, কিন্তু আমাকে এতটা আপনজন মনে যে করে তার ব্যথা বেদনা বুঝবার ক্ষমতা তো আমার নেই। জান ভাই, সেবার সেই বামপন্থীদের আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল। চুয়াত্তরের মে মাসে খাদ্যের দাবীতে আড়াইশত মহিলা সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। এই ইতিহাসের একটি অধ্যায় হল নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের নেত্রীদের বিবৃতি। ওঁরা জেল থেকে ফিরে এসে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা পড়বার পর আমি আমার দুঃখ ও ব্যথাকে সামান্য ক্ষতি মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি ভাই। একটু বস, আমি ভাই বিবৃতিটি এনে দিচ্ছি।

মেনকা পাশের ঘরে গেল বিবৃতিটি আনতে। নকুলবাবু হাত মুখ ধুয়ে এসে নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন, অনেকটা রাত

হয়ে গেছে। এবার তুমি বাড়ি ফিরে যেতে পার। অবশ্য না গেলেও আমার কোন আপত্তি নেই।

আমার আপত্তি আছে বাবা। বলতে বলতে মেনকা কয়েকখানা কাগজ হাতে করে ঘরে ঢুকে বলল, আমার আপত্তি আছে। কারণ করবী সারা রাত ধরে চিন্তা করবে, অথবা ছুটে আসবে। আজকের এই তমসাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় জওয়ান ছেলে সময়মত বাড়ি না ফিরলে উৎকণ্ঠার শেষ থাকে না। এই অশান্তিজনক অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত হবে কি? এই নাও ভাই সেই বিবৃতি।

কয়েকখানা ছাপা কাগজ অনিমেষের হাতে তুলে দিয়ে বলল, পড় ভাই।

অনিমেষ পড়বার চেষ্টা করতেই মেনকা বলল, একটু জোরে পড়। সবাই শুনতে পাবে।

আপনারা কি এর আগে পড়েন নি?

না পড়লে কি করে সব জানলাম! আরেকবার তোমার মুখে শুনলে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি হবে।

অনিমেষ কথা না বাড়িয়ে কাগজখানা জোরে জোরে পড়তে থাকে।

"প্রেসিডেন্সী জেলে আটক মহিলা বন্দীদের ওপর পুলিশের নারকীয় নির্যাতনের কয়েকটি রোমহর্ষক অভিযোগ পাওয়া গেছে।"

"উক্ত জেলের মহিলা ওয়ার্ডে আটক নকশালপন্থী বলে সাত জন তরুণী ও ষাট বছরের এক বৃদ্ধাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে প্রতি মাসে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় জঘন্যভাবে অত্যাচার করে।"

"ওই তরুণীদের লালবাজারের এক ভূগর্ভস্থ কক্ষে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে বীভৎস শারীরিক নির্যাতন করা হয়। তরুণীদের দেহ অনাবৃত করে গলা, বুক, পেট এবং শরীরের অন্যান্য নরম অংশে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পুলিশ এঁদের

মলদ্বারে শিক ঢুকিয়ে দেয়। এর ফলে অনেকের মলদ্বার ও যৌনাঙ্গের মাঝের পর্দাটি ছিঁড়ে গেছে বলে জানা গেছে। এর সঙ্গে চলে অশ্রাব্য গালিগালাজ ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী।"

"নারকীয় অত্যাচারে জর্জরিতা তরুণীরা অচৈতন্য হয়ে পড়লে পুলিশ তাদের সংজ্ঞাহীন দেহগুলিকে টেনে হেঁচড়ে ভ্যানে তুলে সবার অলক্ষ্যে জেলে ফেলে দিয়ে আসে। অতঃপর এই অবস্থায় বিশ বাইশ দিন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী থাকার পর আবার তাঁদের লালবাজারে ডাক পড়ে। আবার চলে ভয়াবহ অত্যাচার। মাসের পর মাস এই তরুণীরা জেল হাজতে বসে কিছু পুলিশের পাশবিক প্রবৃত্তির শিকার হচ্ছেন।"

"এই ধরনের বর্বর অত্যাচার যদি অবিলম্বে বন্ধ না হয় তা হলে এই তরুণীরা অল্পদিনের মধ্যেই হয় মারা পড়বেন নতুবা বিকলাঙ্গ অথবা উন্মাদ হয়ে যাবেন বলে সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা।"

চিৎকার করে উঠলেন নকুলকাকা।

ক্রুট্ ক্রুট্। আমরা নাকি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। হিটলারের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি নিজের ক্ষমতা কায়েম রাখতে বলেছেন, I will fight to finish, এই finish করার ধরণ, এতে যারা finish হবে তারাই প্রধানমন্ত্রীর finish হবার পথ খুলে দেবে। উঃ, কি সাংঘাতিক এই মহিলা প্রধানমন্ত্রী!

মেনকা বলল, আরও আছে এই বিবৃতিতে। তুমি পড় অনিমেষ।

"প্রেসিডেন্সী জেলের মহিলা ওয়ার্ডে এদের সাতজনকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হয়েছে। এমন কি গণ আন্দোলনে ধৃতা মহিলাদের সঙ্গেও এঁদের দেখা সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না। এই সাতজন মহিলাকে রাখা হয়েছে উন্মাদ মহিলাদের পাশে।"

"এঁরা (তরুণী বন্দীরা) অধিকাংশই বিচারাধীন বন্দী, তবু কোন-

দিনই এঁদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয়নি। এই তরুণীদের মামলার দিন কোর্টের গেটে হাজির করা হয় কিন্তু তাদের পুলিশ ভ্যানে বসিয়ে রেখে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই করিয়ে আনা হয়। লাঞ্ছিতা তরুণীরা কোর্টে দাঁড়িয়ে এই নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী পাছে ফাঁস করে দেন সেই ভয়েই নাকি এদের কোর্টে হাজির করা হয় না বলে জানা গেছে।"

"এতদিন এই মধ্যযুগীয় অত্যাচারের কাহিনী লৌহকারার অন্তরালে চাপা ছিল। কিন্তু তেসরা মে নয়টি বামপন্থী দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত এবং প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরিত নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের কয়েকজন নেত্রী জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই বীভৎস কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছেন।"

পড়া থামিয়ে অনিমেষ বোকার মত মেনকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেনকা বলল, পড়লে তো? এরপর আমার দুঃখ করার কিছু থাকে কি?

অনিমেষ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলল, কিন্তু এরা কারা যাদের অনুমোদন ও প্রশ্রয়ে এই নারকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে।

নকুলবাবু বললেন, সেই fight to finish রাজনীতির প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনে এবং তার অতি বশম্বদ স্তাবকতুল্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ও প্রশ্রয়ে পুলিশ এই কাজ করছে, যতদিন শাসনভার এই পাপীষ্ঠগোষ্ঠীর হাতে থাকবে ততদিন এই ঘটনা ঘটবে।

মেনকা বলল, সংবাদপত্রের এই অংশটুকু পড় অনিমেষ।

(দর্পণ—আঠাশে জুন চুয়াত্তর সাল)

"সম্প্রতি এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশনকে কেন্দ্র করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এবং বুদ্ধিজীবি লেখক শিল্পীরা আজ সোচ্চার হয়েছেন রাজনৈতিক মর্যাদা দানের

দাবীতে। রাজ্য সরকারের টনক নড়েছে। লালবাজার এবং পুলিশ মহলও একটা লোক দেখানো তদন্তের ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু প্রথম থেকেই এ সম্পর্কে সরকারী প্রচার শুরু হয়ে গেছে। স্বয়ং কারামন্ত্রী শ্রীজ্ঞানসিং সোহনপাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, শ্রীমতী রাজ্যশ্রী দাশগুপ্তা এবং শ্রীমতী মীনাক্ষী সেনগুপ্তা না কি কারামন্ত্রীর কাছে কোন অত্যাচারের অভিযোগ করেননি। কিন্তু পরদিনই সংসদ সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্তের কাছে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। ইতিপূর্বে নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের দায়িত্বশীল নেত্রীরাও এই অভিযোগ লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন। একথা খুবই স্বাভাবিক যে, কোন মহিলার পক্ষে, বিশেষ করে তিনি যদি উচ্চশিক্ষিত এবং রাজনীতিগতভাবে সচেতন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না হন, তাঁর নারীত্বের নগ্ন অবমাননার কথা ঋজুকণ্ঠ উচ্চারণে বিবৃত করতে পারেন না। বিশেষ করে এমন লোকের কাছে যাঁর প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ প্রশ্রয়ে অপ্রকাশিত সেই দানবীয় উন্মত্ততার ভিত্তি রচনা করেছে। এ কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, রাজ্যশ্রীর স্বামী রণজয়কে আলিপুর জেলে আরও অনেকের সঙ্গে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে এবং একথাও ঠিক যে রাজ্যশ্রী মত সিঁথির সিঁদুর মুছে যাওয়া মেয়েরা আজ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন হত্যাকাণ্ডের নৈতিক নায়কদের এই তদন্তের প্রহসনকে।

"কারামন্ত্রী সোহনপালজী কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী কি জানতে চান রাজনৈতিক বন্দিনীদের ওপর পুলিশী অত্যাচারের কাহিনী? তারা শুনুন যে শুধু রাজ্যশ্রী কিম্বা মীনাক্ষীই নয়, আরও অনেকের ওপরই চলেছে বর্বর অত্যাচার, ধর্ষণ, দেহের কোমলাঙ্গে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা, মলদ্বারে এবং যৌনাঙ্গে গরম ডিম এবং লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কোন বর্বর প্রক্রিয়াই বাদ যায়নি। এই অত্যাচারে আজ পাগল হয়ে গেছেন দুই সন্তানের জননী শ্রীমতী শিপ্রা রায়, এই অত্যাচারের ফলে প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর দিন গুনছেন শ্রীমতী

জয়া চৌধুরী। তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় মুক্তি দিয়ে সরকার হত্যার দায়িত্ব এড়িয়েছেন। প্রতিদিন তাঁর রক্ত বমি হচ্ছে। শ্রীমতী কল্পনা চক্রবর্তীর ওপর দানবীয় অত্যাচারের পর পুলিশ শুধুমাত্র সায়া ও ব্লাউজ পরিহিত অবস্থায় ফেরত দিয়ে গেছে জেল গেটে। ঘটনাকাল উনিশে জুলাই একাত্তর সাল। এমনি অত্যাচারের শিকার হয়েছেন শ্রীমতী ডালিয়া ব্যানার্জি, শ্রীমতী বিজলী কুণ্ডু এবং আরও অনেকে।"

পড়লে তো? সভ্য সমাজে এই নারকীয় ঘটনা কোথায় ঘটতে পারে? একমাত্র স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় এই সব ঘটে। ঘটেছে হিটলারের রাজ্যে, মুসোলিনীর রাজ্যে। আর তারই অনুবৃত্তি ঘটছে ভারতে। আমরা গণতন্ত্রী ও অহিংসাবাদী তথাকথিত গান্ধীবাদীদের রাজ্যে বাস করি।

নকুলকাকা বললেন, প্রভুর নির্দেশে যারা এই কাজ করেছে তারাও সমভাবে অপরাধী। চাকুরী রক্ষার নেশায় এরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে। ইংরেজ সরকার খুবই অত্যাচার করেছিল স্বদেশী করা মানুষদের ওপর কিন্তু এমন নারকীয় ঘটনা কখনও তারা ঘটায় নি। কিন্তু এই সব বেতনভোগী পাপাচারী কারা?

মেনকা মৃদুকণ্ঠে বলল, এদের নাম সবাই জানে, সাহস করে বলতে পারে না। লালবাজারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী যে জহ্লাদ ও ইতর পশুবাহিনী গড়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনিই এই পাপের জন্য অপরাধী। আর জহ্লাদ ও পশুবাহিনীর নেতা যে ডেপুটি কমিশনার ও তার অনুচরের দল তাদের অপরাধ অমার্জনীয়। প্রকাশ্য আদালতে বিচার না করে গণআদালতে এদের বিচার হওয়া উচিত এবং এই পাপীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।

অনিমেষ বলল, উচিত তো অনেক কিছু কিন্তু কে সেই উচিত কাজ করবে?

মেনকা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, রাত বারোটা বাজতে দেরী নেই। তুমি এখনই ট্যাক্সি ডেকে রওনা হও। কিছু ঘসতে চাও?

প্রয়োজন নেই। আজ সহানুভূতি ব্যঙ্গ বলে মনে হয়। প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস সেদিন ফেলব যেদিন এই পাপীষ্ঠ শাসকরা শাসন ক্ষমতাচ্যুত হবে। তারপর যেদিন এদের দাঁড়াতে হবে বিচার ফল মাথায় তুলে নিতে, সেদিন পাব অপরিসীম শান্তি।

অনিমেষ ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

নকুলকাকা বোধহয় তখন অতীতের সুখস্মৃতি চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আত্মকথা লেখার অবসর নকুলকাকা পেলেন না। হঠাৎ একদিন হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন বন্ধ হয়ে বিদায় নিলেন ধরাধাম থেকে। যাবার বেলায় রেখে যাননি কিছুই। মেনকা একা। সহায় সম্বলহীন। নকুলকাকার মৃত্যুর পর শোকসভা কেউ করেনি, অসহায় মেনকাকে সহানুভূতি জানাতে পড়শীরাও একবারও এল না। মেনকাও কেমন যেন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সত্যনাথের স্মৃতি তাকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে, আবার মাঝে মাঝে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। এরজন্য প্রস্তুতি নেওয়াই তো ছিল সত্যনাথের শিক্ষা। সে শিক্ষাকে ব্যর্থ হতে দিতে সে পারে না।

একটা মাস কেটে গেল।

একদিন শেষরাতে দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দে মেনকা জেগে উঠল। নিঃশব্দে উঠে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল। শেষ রাতে নিঃশঙ্কভাবে দরজা খুলে বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়। উঁকি মেরে দেখল, একজন লোক দাঁড়িয়ে দরজায়। বহুজন নয়। একজন মাত্র। মেনকা সাহস করে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি। আমি অমিয় পাল চিনতে পারছেন না?

অমিয় পাল? কোথা থেকে আসছ? তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। কেন এসেছ? আর শেষ রাতে কেন?

আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না? নকুলকাকার কাছে একবার এসেছি সত্যদা যখন জীবিত ছিলেন।

থমকে গেল মেনকা। অমিয় পাল নিশ্চয়ই নিশ্চিতভাবে জানে সত্যনাথ জীবিত নেই।

কি ভাবছেন বউদি?

ভাবছি অনেক কিছু। ওসব শুনে কি হবে। দাঁড়াও আমি দরজা খুলছি।

মেনকা দরজা খুলে দিতেই অমিয় পাল যেন দৌড়ে ঢুকে পড়ল ঘরে!

কিছু খাবার আছে বউদি?

মেনকা তীক্ষ্ণভাবে অমিয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

খাবার আছে বউদি?—আবার জানতে চাইল অমিয় পাল।

মুড়ি খাবে?

একটা কিছু পেলেই প্রাণরক্ষা হয়। তাই দিন।

এক বাটি মুড়ি আর এক ঘটি জল খেয়ে সুস্থির হয়ে বসল অমিয় পাল।

তুমি বিশ্রাম কর। এই মাদুরটায় শুয়েও পড়তে পার।

আপনাকে কি ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না।

কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়। বিশ্রাম কর। রাত শেষ হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকালের আলো দেখা দেবে। তখন তোমার সঙ্গে কথা বলব।

অমিয় পাল মাদুরে গা এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা দশটার সময় মেনকা ডেকে তুলল অমিয়কে।

লজ্জিতভাবে অমিয় বলল, অনেক বেলা হয়ে গেছে বউদি। আগে কেন ডাকলেন না।

মেনকা হেসে বলল, তুমি খুবই ক্লান্ত ছিলে। দীর্ঘদিন তোমার অনাহার। খাবারের ব্যবস্থা করে তবেই তোমাকে ডেকেছি। এবার উঠে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।

অমিয় পাল মুখ ধুয়ে স্নান করে এল। মেনকাও খাবার এনে দিল তার সামনে।

প্রায় আট দিন স্নান করতে পারিনি, বলেই পরম তৃপ্তির সঙ্গে আবার বলল, শরৎচন্দ্র বলেছেন, আমাদের দেশে মা-বোনেরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আজ বুঝছি সত্যিই তাই। খুঁজে নেবার অবকাশ থাকলে বিফল মনোরথ হতে হয় না।

মেনকা হেসে বলল, অত বেশি বলতে হয় না ভাই। চাট্টি ভাত আর থোড় ভাজা সামনে নিয়ে মা-বোনদের অত প্রশংসা করলে এর পর এক ঘটি জলের বেশি কিছুই পাবে না।

খেতে খেতে অমিয় বলল, জলও তো কেউ দিতে চায় না বউদি। শুনবেন সব ঘটনা।

মেনকা নিরাসক্তভাবে বলল, আর শুনে কি হবে। সেই তো পুলিশের অত্যাচার, আর ধর্ষণ আর হত্যা।

অবশ্যই তাই। তবুও সব ঘটনা তো জানা যায় না। দু একটা যা দেখেছি তাই বলা সম্ভব। সেটাই বলতে চাইছি। অবশ্যই আপনার জানা দরকারও মনে করি।

অমিয় পাল শুরু করল তার কথা।

দুই বন্ধু।

পরিচয় হল, শ্রীচরণ চোর আর নেপু চোর।

মধ্য কলকাতার ব্যস্ততাপূর্ণ অঞ্চলে 'ইধারকা মাল উধার ঔর উধারকা মাল ইধার' করা ওদের কাজ। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে, পাইকারী হারে ধোলাই খায়, কেউ তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় না। পাড়ার ছেলে, মুরুব্বীর জোর আছে। গোলমাল শুনে পাড়ার লোকরা জমায়েত হয়, 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন' বলে ছাড়িয়ে আনে।

এইভাবেই তাদের জীবন যাত্রা চলছিল।

হঠাৎ পরিবর্তন এল, দুজনকেই পুলিশ পাকড়াও করল। কেস হল না, মগজ ধোলাই হল। নেপু চোর চাকরি পেল পুলিশে। অর্থাৎ

নেপু হল পুলিশের সেপাই। শ্রীচরণ পুলিশে চাকরি করতে রাজি হল না। তার দারিদ্র ও অসদাচারের জন্য সে নিজেকে কখনও দায়ী মনে করত না। সে বলত, আমরা তো ভাল মানুষ, খারাপ করেছে ওরা, মানে যারা রাজ্য চালাচ্ছে।

পাড়ায় পাড়ায় তখন মার্কসবাদী লেনিনবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি গজিয়েছে। তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতে থাকে শ্রীচরণ। দলের স্থানীয় নেতা কেষ্ট সান্যালের সে হয়ে উঠল দক্ষিণ হস্ত।

কেষ্ট সান্যাল মেধাবী ছাত্র। আগে কাজ করত এ্যাকাউন্টেট জেনারেল অফিসে। কিছুকাল পরে চাকরি পেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। পাড়ার কোন লোকই জানত না কেষ্ট সান্যাল কোথায় চাকরি করে। কেষ্ট সান্যালের চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। অল্প বয়সী যুবক; অতি সাধারণ বেশভূষা, অতি সরল তার চলাফেরা। সহজে কেউ তাকে চিনে উঠতে পারত না।

কেষ্ট সান্যাল দল সংগঠিত করেছিল। তার স্বভাব ছিল শশকের মত। কোথাও বেশিক্ষণ স্থির থাকত না। সামান্য কথা বলত, সব সময় কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে চলাফেরা করত যাতে সহজে কেউ তাকে সনাক্ত করতে না পারে।

কেষ্ট সান্যালের অনুগামী অনুপকুমার ইনজিনিয়ারিং-এ ছাত্র। শোভাবাজার এলাকায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের আবাসে তাদেরই সমধর্মী একজনের কাছে।

প্রয়োজন হল দেহ থেকে বুলেট বের করার।

মেডিক্যাল কলেজে অপারেশন করা হল অতি গোপনে এবং গোপনেই তাকে ভর্তি করা হল অন্য নাম দিয়ে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে।

সংবাদ যথাসময়ে পেয়েছিল কেষ্ট সান্যাল।

কমরেডকে দেখতে যেত রোজই কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে।

অনুপের পাশের বেডে ছিল একজন পুলিশ কেসের আসামী। শোনা যায় সেও নকশালপন্থী। তাকে পাহারা দিত পুলিশ, গোয়েন্দা আসত জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তাদের সন্দেহ হল পাশের বেডে যে যুবকটি আছে সেও বোধহয় নকশালপন্থী। পুলিশ নজর রাখল পাশের বেডের ওপর।

রোজই তিন চারজন যুবক যেত অনুপকে দেখতে। তাদের কথোপকথন শুনত পুলিশ। তাদের সন্দেহ দৃঢ় হল।

কিন্তু এই সব যুবকদের পরিচয় কি?

ওদের অনুসরণ করে জানতে পারল ওদের বাসস্থান কোথায়। আরও সংবাদ নিয়ে জানল, ওরা কেষ্ট সান্যালের অনুগামী। প্রয়োজন হল কেষ্ট সান্যালকে খুঁজে বের করা।

নকশালপন্থীদের দলে ছিল বাবুচাঁদ নামে সতর আঠার বছরের একটি তরুণ। পুলিশ তাকে বজায় নিয়ে এল। তাকে বলল, কেষ্ট সান্যালকে চিনিয়ে দিতে হবে। উপায়ও তারা বের করে দিল।

প্রত্যহ বিকেলে কেষ্ট সান্যাল অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে যেত হাসপাতালে। এই সময় গোপনে তাকে চিনিয়ে দেবে বাবুচাঁদ।

সেদিন বিকেলে কেষ্ট সান্যাল, বিধু, শঙ্কু, খোকন, বাবুচাঁদ ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে হাসপাতালের সামনে এসে দু ভাগ হয়ে গেল।

কেষ্ট, বিধু, রাণা, আর শঙ্কু হাসপাতালের দিকে এগিয়ে গেল।

অপর দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে খোকন, বাবুচাঁদ ইত্যাদি।

কেষ্ট হাসপাতালের গেট পেরোবার আগেই লক্ষ্য করল আঙ্গিনায় পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গীদের একজন বলল, আজ যেয়ে কাজ নেই কেষ্টদা। পুলিশের মতলব ভাল নয়। আপনাকে ধরলে পার্টি অচল হয়ে যাবে।

কি যে বলিস। আমাকে কেউ চেনে না। আচ্ছা, রাণা তুই যা, আমরা এখুনি ঘুরে আসছি।

রাণা রাস্তা পার হচ্ছে এমন সময় অপরদিকের ফুটপাথ থেকে বাবুচাঁদ চিৎকার করে বলল, কেষ্টদা আমরা যাচ্ছি।

কেষ্ট গেটে প্রবেশ করতে করতে হাত তুলে জানাল, আচ্ছা।

সাদা পোষাকে পুলিশ ছিল পাশেই। কেষ্ট সান্যাল সনাক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনের ওপর।

পর্দার ওপারে রয়ে গেল বাবুচাঁদ।

পুলিশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

অনুপকেও হাসপাতাল থেকে টেনে নিয়ে গেল পুলিশ।

তাদের ওপর কতটা অত্যাচার ও লাঞ্ছনা হয়েছিল তা কেউ জানে না।

পরের দিন সকালে সবাই শুনল, ভবানী দত্ত লেনের মুখে চারজন নকশালপন্থী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

তারপরের দিন সংবাদপত্রে পুলিশের ভাষ্য বের হল।

কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নকশালপন্থী একটি গোপন সভায় মিলিত হয়েছিল। পুলিশ সংবাদ পেয়ে ঘেরাও করে। নকশালপন্থীদের সঙ্গে গুরুতর লড়াই হয়। নকশালপন্থীরা বোমা ও পাইপগান নিয়ে আক্রমণ করে। পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়। এর ফলে চারজন নকশালপন্থী নিহত হয়, অপর কয়েকজন পালিয়ে যায়।

কেষ্ট সান্যালদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ সারারাত তাদের নানা স্থানে নিয়ে যায়, তল্লাসী করে। কোথাও কিছু আপত্তিজনক না পেলেও পুলিশ তার পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মোটেই ত্রুটি করেনি। শেষ রাতে তাদের ভবানী দত্ত লেনের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে। গুলি করবার আগে পুলিশ কয়েকটি বোমা ফাটায়। ফুটপাতে যারা শুয়েছিল তারা বোমার শব্দে জেগে উঠে এবং পালাতে থাকে। নিকটবর্তী বাড়ির জানালা খুলে স্থানীয় লোকরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

ঘটনা স্থলের বিপরীত দিকে থাকতেন মেডিক্যাল কলেজের

একজন ডাক্তার। পরদিন তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ। শেষ রাতে সবাই শ্রাদ্ধের জোগাড় করছিল। বোমার শব্দে সবাই তিনতলার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রত্যক্ষ করেছিল ঘটনা। তারা শুনেছিল কেষ্ট সান্যালের কণ্ঠ, "কেষ্ট সান্যালকে হত্যা করলে বিপ্লব রোধ করা যাবে না।"

খাওয়া বন্ধ করে অমিয় পাল ঘটনাটা বলে চলছিল।

মেনকা বলল, কেষ্ট সান্যাল বোধ হয় ভুল বলেনি। কিন্তু কেষ্ট সান্যালের কি অপরাধ? সে কি খুন জখম করে বেড়াত?

কেষ্ট সান্যাল এমন একটি লোক যে কাউকে একটা চড় মারতেও পারত না।

তোমার এই কাহিনী কতটা সত্য জানি না তবে ভয়ঙ্কর।

ঘটনা নিখাদ সত্য। জানেন বউদি, কেষ্ট সান্যালের দাদা প্রমাণ সংগ্রহ করে আদালতে নরহত্যার অভিযোগ করেছিল।

মামলা চলেছিল কি?

না। চালাতে সাহস পায়নি। কেষ্ট সান্যালের ছোট ভাইকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কেষ্ট সান্যালের বাবা শঙ্কিত হয়ে মামলা চালাতে নিষেধ করেছিল।

খাওয়া শেষ করে অমিয় পাল বলল, আপনি খাবেন না?

আমি তো এখন খাই না। তোমার দাদা অফিস থেকে ফিরে এসে না খেয়েই থানায় গিয়েছিল। তারপর থেকে আর ফেরেনি। সন্ধ্যা না পেরোলে সেই কারণেই আমি দাঁতে কুটো কাটি না।

অমিয় পাল অবাক হয়ে মেনকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হল না।

কি ভাবছ অমিয়?

আপনার কথা ভাবছি। এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য হবার পরও, আপনি যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিচ্ছেন তাতে

আমি বিস্মিত। আপনাকে একটা প্রণাম করতে চাই। বলেই অমিয় পাল মেনকার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমিয় পাল বলল, ঘটনার শেষ কিন্তু এখানেই নয়। কেষ্ট সান্যালের অনুগামীরা সব ঘটনাই জানতে পেরেছিল। শ্রীচরণ এদেরই একজন। সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিছু করার আগেই তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। জামিনে খালাস হয়ে ফিরে এল ইতিমধ্যেই।

কেষ্ট সান্যালের আরেকজন অনুগামী ছিল শেখর গুহ। শোনা যায় বেহালায় তার বাড়ি। ধনীর সন্তান। বি-কম পাশ করেছিল। কেষ্ট সান্যালের মত সে নেতৃত্ব দিত। মধ্য কলকাতায় তার আস্তানা। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। কেন? সেটা পুলিশও জানে না। জানার দরকারও ছিল না।

একদিন শেখর বসে ছিল একটা মেস বাড়ির সামনে। বেঞ্চ পেতে বসে গল্প করছিল তার বন্ধুদের সঙ্গে।

পুলিশ সংবাদ পেয়েছিল শেখর সকালের দিকে গলিতে আসে সংবাদদাতা আর কেউ নয়, সেই বাবুচাঁদ।

গলিতে দেখা গেল একজন হৃষ্টপুষ্ট সাধারণ ধরণের মানুষ মাথায় ঝাঁকা নিয়ে চলেছে। যেমন পুরানো কাগজ ক্রেতারা লোকের দরজায় দরজায় যায় ঠিক সেই রকম ধরণ। তার পেছনে পেছনে ছেঁড়া লুঙ্গিপড়া দু তিনজন লোক। তারা নোংরা বস্তা পিঠে নিয়ে কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

শেখর যেখানে বসেছিল সেখানে এসেই ঝুড়ি মাথায় লোকটা হঠাৎ শেখরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েই শেখরের মাথায় ঝুড়িটা ফেলে দিলে। শেখর কিছু বুঝবার আগেই কাগজকুড়ানোর দল বস্তা ফেলে দিয়ে রিভলবার বের করে ঘিরে ধরল শেখরকে। শেখর বন্দী হল।

জামিনে শেখরও ফিরে এল নিজের জায়গায়।

আবার পুলিশ গ্রেপ্তার করল শেখরকে। "বোমা বিশারদ" বলে প্রচার করে পুলিশ শেখরের জামিনে আপত্তি করে। তাতেও কোন ফল হল না, শেখর আবার জামিন পেল।

কেষ্ট সান্যালের জন্য যে পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল লালবাজারে, অনুরূপ ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হল। তৈরী হল শেখরকে হত্যা করার ব্লুপ্রিন্ট।

রাত প্রায় দশটা বাজে।

শেখর বিষ্টু আর বাবুচাঁদ এগিয়ে চলেছে। শেখর চায় রাত্রিবাসের মত স্থান। তার প্রোগ্রাম ছিল পরদিন কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। পুলিশের অত্যাচারে তার পক্ষে কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়।

শেখর বলল, আজ রাতটা কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে পারিস বিষ্টু?

বিষ্টু কিছু বলার আগেই বাবুচাঁদ বলল, একটা জায়গা আছে। সেখানে নিরাপদে থাকতে পারবে শেখরদা। তোমরা দাঁড়াও, আমি জায়গাটা দেখে আসি।

বাবুচাঁদ চলে গেল।

সে গেল নিরাপদ স্থান দেখতে নয়। সে গেল বড় রাস্তার মোড়ে। সেখানে সাদা পোষাকে পুলিশ অপেক্ষা করছিল। তাদের পরামর্শ মত কোথায় শেখরকে নিয়ে যেতে হবে তা স্থির করে ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ, অমুক রাস্তায় অমুক বাড়ীতে থাকতে পারবে শেখরদা। খাবার ব্যবস্থাও করে এসেছি। একটা রাত বেশ থাকতে পারবে। বাড়ীর পেছনে একটা দরজা আছে। পুলিশ এলে পালাতেও পারবে।

বাবুচাঁদ যখন আশ্রয় ঠিক করতে গিয়েছিল তখন শেখর বিষ্টুকে বলল, বাবুচাঁদকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমার মনে হয় কেষ্টদাকে ধরিয়ে দেবার পেছনে বাবুচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা আছে। ওর ওপর নজর রাখিস।

বিষ্টু বলল, আমরা নজর রেখেছি। কেষ্টদার মৃত্যুসংবাদ অর্থাৎ তাকে খুন করার সংবাদ পাওয়া মাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছিল সেটা মনে আছে কি? সেদিন ওদের একজন বলেছিল, পুলিশ নাকি বলেছে, নকশালদের দলে আমাদের লোক না থাকলে কি কেষ্ট সান্যালকে ধরতে পারতাম।

শেখর অন্যমনস্কভাবে বলল, শোন বিষ্টু, যদি আমি জীবিত না থাকি, আমার যদি কিছু হয় তা হলে স্থির জানবি, বাবুচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

ইতিমধ্যে বাবুচাঁদ ফিলে এল।

তিনজন রওনা হল। বিষ্টু গেল ডান দিকে, বাঁ দিকের পথ ধরে চলল শেখর আর বাবুচাঁদ। রাত তখন এগারটা বেজে গেছে। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গলির মুখে আসা মাত্র পুলিশ ঘিরে ফেলল শেখরকে।

শেখব দেখল বাবুচাঁদ নিমেষে আত্মগোপন করেছে।

বাবুচাঁদ ছুটতে ছুটতে ডান দিকের পথ ধরল। কিছুটা গিয়েই দেখা হল বিষ্টুর সঙ্গে।

কি খবর বাবুচাঁদ?

শেখরদাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বিষ্টু চমকে উঠল। মুখে কিছু না বলে জোরে পা ফেলতে আরম্ভ করল। বাবুচাঁদকে ইঙ্গিতে বাড়ি যেতে বলা মাত্র বাবুচাঁদ গলিতে আত্মগোপন করল।

রাত চারটের সময় পল্লীর মানুষরা বোমার শব্দে জেগে উঠল। সামনে ডাকঘর। ডাকঘরের অধিকর্তা দোতালার জানালা খুলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলেন সব ঘটনা।

বাঁচাও বাঁচাও শব্দ শোনা গেল দু বার। তাবপরেই মাগো আর্তনাদ। শেখরের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পল্লীর মানুষ বুঝল, শেষ রাতে কোন যুবককে পুলিশ হত্যা করল। বোমা ফাটিয়ে

পুলিশ জানাতে চেয়েছে, নকশালরা বোমা ছুঁড়েছে, পুলিশও গুলি চালিয়েছে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে একজন। পুলিশ এই স্টেরোটাইপ কায়দায় প্রচার করল দুদিন বাদে। বোমা বিশারদ শেখর গুহ পুলিশের ওপর বোমা নিয়ে আক্রমণ করায় পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সভ্য মানুষেরা দুঃখ পেল, হাসল কিন্তু করণীয় কিছু আর রইল না।

খুব ধুমধামের সঙ্গে শ্যামা পূজা শেষ হয়েছে।

পরের দিন সকাল বেলায় পাড়ার কিশোরদের সঙ্গে শ্রীচরণ বাজি ফাটাচ্ছে। এমন সময় পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে এল চোর নেপু। নরহত্যার আগে পুলিশের প্রচার ব্যবস্থাকে জোতদার করতে যে বোমা ফাটানো হত তার নায়ক ছিল চোর নেপু। বোমা ফাটাবার সময় তার একটা হাত উড়ে যায়। অতীতে সে ছিল শ্রীচরণের বন্ধু। সেজন্য শ্রীচরণকে সনাক্ত করার উপযুক্ত লোক হল নেপু। আজ নেপু প্রথম নামল গাড়ি থেকে। পেছন পেছন নামল আরও সাত আটজন সাদা পোষাকে কনষ্টেবল ও দু-তিনজন গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা জমাদার। তাদের দেখেই শ্রীচরণ দিল দৌড়। পেছন পেছন ছুটল পুলিশ। শ্রীচরণ ঢুকে পড়ল বস্তীতে।

এক বৃদ্ধার ঘরে ঢুকে শ্রীচরণ লুকিয়ে পড়ল একটা তক্তপোষের পাশে গাদা দেওয়া বস্তার তলায়।

পুলিশ বস্তীতে ঢুকে প্রত্যেকটি ঘর তল্লাস করল। কোথাও শ্রীচরণকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসছিল। এমন সময় তাদের সন্দেহ হল বস্তার পাশে শ্রীচরণ থাকতে পারে। তারা বস্তা তুলতেই শ্রীচরণকে দেখতে পেল। দেখা মাত্র তিন চার জন একসঙ্গে তার গলা টিপে ধরল। শ্রীচরণ কোনরূপ শব্দ করার আগেই দম বন্ধ হয়ে মারা গেল।

পাশের একটা দোকানে এল একজন দারোগা। লালবাজারে ফোন করল মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী পাঠাতে।

"আমি প্রদীপ বলছি স্যার। আসামীর জন্য একখানা গাড়ি পাঠিয়ে দিন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে একখানা কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল বস্তীর সামনে। শ্রীচরণের মৃতদেহ টেনে তোলা হল গাড়িতে। শ্রীচরণের মৃতদেহ যারা দেখেছিল তারা বলেন, চোখ দুটো যেন ফেটে বের হচ্ছিল।

মেনকা বলল, এতো রোমহর্ষক কাণ্ড। গুলি করে মারা এক কথা আর মানুষের গলা টিপে মারা আলাদা কথা। এমন নৃশংস ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

অমিয় পাল বলল, একটা ছোট এলাকায় এই ভাবে ছয়টি তরুণকে হত্যা করেছিল পুলিশ। কেন এসব ঘটল বলতে পারেন? কে এর নায়ক?

মেনকা মৃদুস্বরে বলল, আমার শ্বশুর বলতেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই সব ঘটেছে। তার যারা যন্ত্র তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে পুলিশের কোন কোন বড়কর্তা, আর শোনা যায় যারা জহ্লাদ বাহিনীর অংশ তাদের একজন অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। দারোগা থেকে সে হয়েছে ইনসপেকটার, আর বীভৎস বীরত্বের জন্য তাকে রাষ্ট্রপতির মেডেলও দেওয়া হয়েছে। এদেশে ঘাতকের বড় সম্মান, এদেশে যারা দেশপ্রেমী জনপ্রেমী তাদের বলা হয় সমাজবিরোধী, তাদের হত্যা যারা করে তাদের সম্মানিত করা হয়। আমরা গণতন্ত্রীদেশে বাস করি, আমাদের দেশে আইন আদালত আছে, আমরা সভ্যতার দাবীদার, আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এ সবই প্রহসন, মিথ্যাচার। যারা শাসক তারা ক্ষমতা কায়েম রাখতে যে কোন অন্যায় করে এবং সেই অন্যায়কে মিষ্টি মধুর করতে মিথ্যা প্রচার করছে দিবারাত্র। এর যে শেষ কোথায় কে জানে।

অমিয় পাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শেষ হবে বউদি। অন্যায় চিরস্থায়ী কি হয় কখনও। এমন দিন আসবে যেদিন এই সব হত্যাকারী তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবে, জনতার আদালতে এদের কৈফিয়ত দিতে হবে, বিচার ফল মাথায় পেতে নিতে হবে। যারা আজ দম্ভের শীর্ষে তাদেরই মাথা লুটায়ে পড়বে মাটিতে। মানুষের ঘৃণায় তারা দগ্ধ হবে।

মেনকা হাসল।

হাসছেন বউদি!

না হেসে উপায় নেই। মানুষ সহজেই সব ভুলে যায়। বিচার বিলম্বিত হলে অপরাধীর সাজা হয় না অমিয়। যাক ওসব কথা। এবার তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। বাহির থেকে তালা দিয়ে যাব। পুলিশের নজর রয়েছে আমাদের ওপর।

আরেকটা কথা বলা হয় নি বউদি। সেই যে বাবুচাঁদ। যার জন্য এতগুলো অমূল্যপ্রাণ অকালে ঝরে পড়ল, তাদের জন্য মনের গভীরে মস্ত বড় ক্ষত রয়ে গেছে। সেই বাবুচাঁদের বিচার করল কেষ্ট সান্যালের সহকর্মীরা। একদিন সকালে বাবুচাঁদকে ডেকে পাঠাল ওরা। আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ action-এর বিষয় আলোচনা হবে। আজ সন্ধ্যাতেই action successful করতে হবে। এর জন্য আলোচনা ও কার্যপদ্ধতি স্থির করতে হবে। পার্টি কমরেডদের উপস্থিতি দরকার।

বাবুচাঁদের সামনে আরেকটা সুবর্ণ সুযোগ। বাবুচাঁদ শঙ্কাহীন মনে এল নির্দিষ্ট স্থানে।

নতুন নেতা বলল, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে বাবুচাঁদ।

আমার বিরুদ্ধে? বাবুচাঁদের মুখ শুকিয়ে গেল।

তুমি পুলিশের গুপ্তচর।

বাবুচাঁদ ভীত ভাবে প্রতিবাদ করল।

প্রমান আছে। কেষ্টদা, অনুপ, শঙ্কু, বিধু, শেখরদা ও

শ্রীচরণের মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করে এদের ধরিয়ে দিয়েছ।

না, না, আমি ধরিয়ে দেই নি।

একটা একটা করে ঘটনা বিবৃত করে নেতা বলল, এগুলো সব মিথ্যা?

না, হাঁ, মিথ্যা।

না মিথ্যা নয়। এখনও সত্য কথা বল, নইলে তোমার রেহাই নেই। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হল মৃত্যু। তুমি যা সর্বনাশ করেছ তাতে কজন নিষ্ঠাবান কর্মী আমরা হারাইনি, পার্টি হারিয়েছে অমূল্য সম্পদ। বাবুচাঁদ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আমাদের সর্বসম্মত অভিমত তোমাকে আর বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। প্রস্তুত হও।

কথা শেষ করা মাত্রই তিনজনে বাবুচাঁদকে চেপে ধরল।

একজন একটা ক্ষুর দিয়ে বাবুচাঁদের কণ্ঠনালী কেটে মাটিতে শুইয়ে দিল।

মেনকা শিউরে উঠল।

এও তো কম ভয়ঙ্কর নয়।

বিশ্বাসঘাতকদের সর্বদেশেই শাস্তি দেয়। তবে শাস্তি দেবার পদ্ধতিটা খুবই অরুচিসম্মত।

অরুচিসম্মতই নয়, নৃশংস ও ভয়ঙ্কর। এভাবে মানুষ মারলে কি বিপ্লব সফল হবে। বিপ্লব তো নরহত্যা নয়। আমূল পরিবর্তন না করেও ঘটানো সম্ভব।

আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে হিংসার আশ্রয় যখন নেওয়া হয় দ্বিতীয় কোন পথ খোলা থাকে না বিপ্লবকে সফল করার। সেজন্য হত্যাটাকে রাজনীতি বলা যায় না, রাজনীতির লক্ষ্যে পৌঁছবার বিকল্প পথ। এটা সবাই বুঝেছে, আজ এই সব তরুণদের হত্যার রাজনীতিতে ঠেলে দিয়েছে প্রশাসক, তাদের (অ)-শান্তিরক্ষক আর কয়েকটি

রাজনৈতিক দল। এরজন্য কে দায়ী বলতে পারেন? আমি বলব এরা সবাই নিরপরাধ।

মেনকা বলল, তোমার কথা স্বীকার করছি। কিন্তু ঘটনার গতি তো সত্যিই আনন্দ দান করছে না। এটাও তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার কর। আর কথা নয়। আমি বের হচ্ছি। তুমি শুয়ে পড়। আমার ফিরতে বিলম্ব ঘটবে। বাড়ির বাইরে যেও না। আমি বুঝেছি তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ। নিরাপত্তা তোমার জন্য কোথাও গ্যারান্টিড্ নয়।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব বউদি?

নিশ্চয়।

আপনি আমাকে আশ্রয় দিলেন কেন?

বিশ্বাস এবং নির্ভীকতা।

মাথা নীচু করে অমিয় পাল চুপ করে গেল। মেনকা কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাহির থেকে দরজায় তালা দিয়ে গেল।

অমিয় পাল মাদুরে গা এলিয়ে দিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার সময় মেনকা ফিরে এল বাজার সেরে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই আলো জ্বালালো। অমিয় তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ডেকে তুলতে কেমন মমতা বোধ করল মেনকা।

রান্না ঘরে ঢুকে রান্নার ব্যবস্থা শেষ করে ফিরে এসে দেখল অমিয় উঠে বসেছে।

আজ কোন প্রোগ্রাম আছে কি?

পলায়ন একমাত্র প্রোগ্রাম। চাট্টি খেতে দিন। আবার কদিন খাবার জুটবে না কে জানে।

মেনকা শুধু হাসল।

রাতের বেলায় দুজনে সামনা সামনি বসে খেয়ে নিল। অমিয় প্রস্তুত হল পলায়নের জন্য। মেনকা হাতমুখ ধুয়ে অমিয়র সম্মুখে

এসে বলল, এই কটা টাকা রেখে দাও। বিপদের সময় এটা উপকার করবে।

টাকা গোনা শেষ করে অমিয় বলল, এত টাকা! এত টাকা আমার কাছে থাকা উচিত হবে না। দশটা টাকা নিচ্ছি।

না। সামান্য একশত টাকা। তোমার কাছে রেখে দাও। আমি তোমার শুধুমাত্র দিদি নই, তোমার মায়ের আসনে আমাকে বসিয়ে সেইরূপ সম্মান দিও তা হলে টাকার অঙ্ক নিয়ে মাথা ব্যথা আর হবে না।

সন্তান তো অবাধ্য হয়।

অবাধ্য সন্তানকে স্নেহের প্রলেপ দিয়ে বাধ্য করতে হয় অমিয়।

অমিয় আর কোন কথা না বলে মেনকাকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেনকা।

কতদিন আগের কথা?

খুব বেশিদিন নয়। একাত্তর সালের ঘটনা। উনসত্তর থেকে একাত্তর সাল গড়িয়ে আসতে না আসতে কমপক্ষে তিন হাজার তরুণ তরুণীকে ইহকালের হিসাব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করেছে প্রশাসনের বরকন্দাজের দল আর প্রশাসনের প্রশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধীরা।

পরলোক যাত্রীদের তিন চতুর্থাংশ নক্সালপন্থী বলে অভিহিত। বাকি অংশের বৃহত্তর সংখ্যা হল মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট। অবশ্য প্রশাসক-দলের ও (অ)-শান্তিরক্ষকদের সামান্যতম অংশও সসম্মানে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় সবাইরের নাম থাকলেও, পুলিশের খাতায় সবার নাম নেই। নিহতের তালিকা রাখতে গেলে দায়িত্ব বৃদ্ধিপায়, আইনকে কদলী প্রদর্শন করতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তালিকা রাখে না। সোজাসুজি বলে দেয়, ও নামের কাউকেই তারা

গ্রেপ্তার করেনি। তারা যদি মরে থাকে তা হলে মরেছে নক্সালদের হাতে, অথবা সমাজবিরোধীদের হাতে। দায়িত্ব নেই পুলিশের।

এমনি একজন হলেন সরোজ দত্ত।

সবল সুস্থদেহী বেঁটেখাটো মানুষ। হাস্যমুখর এবং পরিহাসপ্রিয়।

সরোজ দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের এম-এ।

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বেরিয়ে এসে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'অরণি' পত্রিকা বের করলেন, তিনিই সম্পাদক। তাঁর সঙ্গী হলেন, যে কয়েকজন তাদের অন্যতম ছিলেন সরোজ দত্ত।

তার লেখনী তীক্ষ্ণ এবং বক্তব্য বড়ই স্পষ্ট। চিন্তাধারায় সরোজ দত্ত ছিলেন মার্কসবাদী। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রথমাবধি। নিষ্ঠা ছিল তার প্রবল। তবে তার প্রতিবাদের ভঙ্গী ছিল কিছুটা রূঢ় ও আদিম।

অরণি থেকে সরোজ দত্ত এলেন অমৃতবাজার পত্রিকায়। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন সরোজ দত্ত। পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, য়্যাসোসিয়েট সম্পাদক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন। বর্তমান যুগে মার্কসীয় চিন্তাধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন ডক্টর সেন।

তিনি মাঝে মাঝেই সরোজ দত্ত সম্বন্ধে অনেকের কাছে গল্প করতেন। সরোজ দত্তের নির্ভীক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে একদিন বলেছিলেন, সরোজকে তুষারও ভয় করত।

কেন?

সরোজকে প্রায়ই রাতের সহযোগী সম্পাদকের কাজ করতে হত। যে ঘরে বসে তার কাজ করতে হত সে ঘরে যথেষ্ট পাখার বন্দোবস্ত ছিল না। রাতের সহযোগী সম্পাদকদের অনেক সময় গরমে ভেপসে উঠতে হত।

রব উঠল আরও পাখা চাই।

সম্পাদকের কাছে আবেদন জানাল। সম্পাদক নিজেই মালিক। ইচ্ছা করলে যে কোন সময় দু'চার খানা পাখার ব্যবস্থা করা মোটেই

কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু দেব-দিচ্ছি করে মাসের পর মাস কেটে যায় পাখার বন্দোবস্ত আর হয় না। অন্যান্য সহযোগিরা পাখার জন্য গেলেন সম্পাদকের কাছে। সম্পাদক বললেন, শীঘ্রই ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু ব্যবস্থা আর হল না।

সবাই গেল সরোজের কাছে।

দেখছ তো পাখার কোন ব্যবস্থাই হল না। সরোজ তুমি তো এ বিষয়ে কোন চেষ্টাই করছ না। চল আরেকবার মালিকের কাছে যাই।

সরোজ গম্ভীরভাবে বলল, আমি দুই দুইবার গেছি। তাতে যখন হয় নি তখন বার বার গিয়ে লাভ নেই। আমি খোষামোদ করতে পারব না। গরম বেশি পড়লে কাজ বন্ধ করে বসে থাকব।

এতে কি সমস্যা মিটবে।

দেখহে বাপু, পাখা কালকেই আনাতে পারি তবে পথ একটু ঘোরালো।

হোক ঘোরালো, তবুও পাখা চাই।

বেশ আমি আঙ্গুল বাঁকা করেই ঘি তুলব। তোমরা কিন্তু পরে দোষ দিওনা।

আমরা তোমাকে মিষ্টি মুখ করাব যদি কালকেই পাখা আনাতে পার।

সরোজ দত্ত কোন কথা বললেন না।

রাত এগারটা নাগাদ তুষারবাবু শুতে যাবার আগে একবার সম্পাদকীয় বিভাগে এসে বিশেষ বিশেষ কোন খবর থাকলে তা শুনে নেন। তারপর সবাইকে কাজ করতে উৎসাহিত করে ফিরে যান।

সেদিন রাত সাড়ে দশটা বাজতেই সরোজ দত্ত গায়ের জামা খুলে ফেললেন, তারপরই খুললেন পরণের ধুতি।

সহকর্মীরা অবাক হয়ে গেলেন, বুঝলেন সরোজ দত্ত আজ অভিনব কিছু করবেন, হয়ত তার কাজ কিছু ভালগার হতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষারবাবুর গলার শব্দ শোনা গেল।

সরোজ দত্ত তখন প্রস্তুত। পরণের আণ্ডার ওয়ারটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন।

তুষারবাবু ঘরে ঢুকেই সরোজ দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, খুব গরম বুঝি।

সরোজ দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার আগেই তুষারবাবু লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে বললেন, ছি, ছি, তুমি একেবারে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বসেছ।

আজ্ঞে, আপনিও তো আমাদের লজ্জা নিবারণের পথ বন্ধ করেছেন। এই প্রচণ্ড গরমে এই ঘরে বসে কাজ করা কি সম্ভব!

তুষারবাবু দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালেই নতুন পাখা বসানো হল সহযোগী সম্পাদকদের ঘরে।

ঘটনাটা বলেই ডক্‌টর সেন বলতেন, তুষার এই কারণেই সরোজকে ভয় করতো। কখন যে বিরাট কিছু সরোজ ঘটাতে পারে সে বিষয়ে তুষারের কোন সন্দেহ ছিল না।

সরোজ দত্তের এই সব উগ্রতাবাদের আরেকটা দিক ছিল, সেটা হল তার হৃদয়। হৃদয়বত্তার দিক থেকে সরোজ দত্ত ছিল অনন্য।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন বেণী মাধব দাস। তাঁর কন্যা স্বনামধন্যা শ্রীমতী বীণা দাস। কংগ্রেসী এবং কংগ্রেস অনুমোদিত শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালনা করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মীদের ইউনিয়নের পরিচালিকা শ্রীমতী বীণা দাস।

পত্রিকার কর্মীরা দাবী দাওয়া পেশ করল।

মালিকপক্ষ দাবী অগ্রাহ্য করল।

শ্রীমতী বীণা দাসের নেতৃত্বে কর্মীরা ধর্মঘট করল।

মালিকপক্ষ আর শ্রমিকপক্ষের একটা অবমানমাকর চুক্তিতে ধর্মঘট উঠিয়েও নেওয়া হল। কর্মীদের বলা হল বণ্ড দিয়ে কাজে যোগ

দিতে। অবমাননাকর এই বণ্ডে সই করে প্রায় সকলেই কাজে যোগ দিলেও, বণ্ড সই করলেন না ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন, সরোজ দত্ত, শিবশঙ্কর মিত্র প্রভৃতি। এদের অধিকাংশই কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য অথবা সমর্থক।

সরোজ দত্ত বেকার হলেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক স্বাধীনতা বের হতেই সরোজ দত্ত স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত হলেন। কিছুকাল বাদেই স্বাধীনতার ওপর স্বাধীন দেশের স্বাধীন কংগ্রেসী সরকারের নজর পড়ল। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল, কর্মীরা আশ্রয় পেলেন বন্দীশালায়। নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল কর্মীদের জীবনে।

বে-আইনী ঘোষিত কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু সদস্য আত্মগোপন করেছিলেন তৎকালে, আবার কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর থেকে কংগ্রেসী রোষ কিছুটা প্রশমিত হতেই আবার জমজমাট হয়ে উঠল কম্যুনিষ্ট পার্টি।

এবার বের হল গণশক্তি।

চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় আবার বিপর্যয় দেখা দিল। কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হল। সরোজ দত্ত এলেন মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিতে। পার্টির পত্রিকা দেশ হিতৈষী'তে যোগ দিলেন সরোজ দত্ত।

আবার বিপর্যয় দেখা দিল।

এই বিপর্যয়ের জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়, কর্মীরা দায়ী নয়, দায়ী নেতৃত্ব।

যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলার গদীতে বসল।

ভারতের বড় সমস্যা ভূমি সমস্যা। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী। কর্মী ও ছোটখাট নেতারা মনে করেছিল এবার ভূমিহীনরা ভূমি পাবে। ভূমি চোররা শাস্তি পাবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপে কেউ আশ্বস্ত হতে পারল না। কংগ্রেস ও পূর্ববর্তী ইংরেজ সরকার যেমন ভূমি সংস্কারের দিকে ইচ্ছাপূর্বক নজর না দিয়ে ভূমি ব্যবস্থায় দুর্যোগ ডেকে এনেছে, যুক্তফ্রন্ট সরকারও

সেই দুর্যোগকে স্বীকার করেই যেন অগ্রসর হতে চাইছে। প্রবল বাদ প্রতিবাদ উঠল মার্কবাদী পার্টিতে। যারা পরিষদীয় রাজনীতির বিশেষ অনুরাগী আর যারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

ইতিমধ্যে প্রথম হাঙ্গামা হল নকশালবাড়িতে।

অখ্যাত নকশালবাড়ি দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার একটা থানা। ইংরেজ রাজত্বকালে এখানে কোন থানা ছিল না। কংগ্রেস রাজত্বকালে সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য এখানে থানা বসানো হয়েছে।

মান্ধাতা আমলের ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দাবী করল ভূমিহীন দরিদ্র চাষীরা।

চোরাই জমি উদ্ধারে নেমে পড়ল চাষীরা।

সংঘর্ষ হল চাষী-জোতদারে।

পুলিশ ছুটল তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির নির্দেশে।

চাষী আর জোতদারের সংঘর্ষ পরিণত হল চাষী আর পুলিশের সংঘর্ষে।

পুলিশ যা আগেও করেছে সেদিনও তাই করল। গুলি চালালো। গুলিতে একজন মহিলা সহ কয়েকজন নিহত হল, কয়েকজন আহত হল।

চাষীরা আর চুপ করে থাকতে পারল না।

নারীরক্তে মাটি রাঙ্গিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে আন্দোলনের মূল স্থাপন করল তাই বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল ধীরে ধীরে। এর মূল উৎপাটন করতে কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে কমপক্ষে এই আন্দোলনের অংশীদার, সমর্থক সহ বহু নিরীহ যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোর-কিশোরীকে প্রাণ দিতে হয়েছে পুলিশের গুলিতে অথবা সমাজবিরোধীদের

অস্ত্রে, এই নিহতদের সংখ্যা তিরিশ হাজারের মত, এবং এর এক চতুর্থাংশই বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের।

এই সময় ভাঙ্গল মার্কসবাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি।

কম্যুনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে দু ভাগ হয়েছিল।

এবার মার্কস্‌বাদী কমুনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গেও দুখান হল। জন্ম নিল মার্কসবাদী লেলিনবাদী কমুনিষ্ট পার্টি। এরাই খ্যাত হল নকশাল-পন্থী নামে।

নকশালপন্থী দলে যোগ দিলেন সরোজ দত্ত।

তাদের মুখপত্র 'দেশব্রতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন। 'শশাঙ্ক' নাম দিয়ে নকশালপন্থী আদর্শের প্রচারে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন, এবং পার্টি পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন।

নকশালপন্থীরা বে-আইনি সংস্থার সদস্য। তাদের গ্রেপ্তার করা, হত্যা করা, তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হল কংগ্রেসী অহিংস পুলিশের মুখ্য ধর্ম।

সরোজ দত্ত আত্মগোপন করলেন।

খুব বেশি দিন সরোজ দত্ত লুকিয়ে থাকতে পারলেন না! রাজা বসন্ত রায় রোডের একটি বাটী থেকে সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তার সঙ্গে সহবন্দী করলেন দেবীবাবুকে। দুজনকে আনা হল স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তার কোন রেকর্ড নেই। এমন কি সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করার কোন রেকর্ডও রাখা হয়নি, তার নাম লেখা হয়েছিল বৈদ্যনাথবাবু। কোথাকার বৈদ্যনাথবাবু তা আজও জানা যায় নি।

লালবাজারের বিশেষ ঘাতকশ্রেণী গাড়ি নিয়ে এল লর্ড সিংহ রোডে। সেই গাড়িতে উঠিয়ে সরোজ দত্তকে নিয়ে যাওয়া হল ময়দানে। একটা গাছের তলায় তাকে দাঁড় করানো হল।

তখন সবে মাত্র সকাল হয়েছে।

(কোন খ্যাতনামা চিত্র অভিনেতা সেই সময় প্রাতঃ ভ্রমনে বেরিয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এ কে ?)

"এ হল সরোজ দত্ত। তোমার কি দরকার। চলে যাও এখান থেকে।

অভিনেতা স্থান ত্যাগ করার পরই শোনা গেল গুলির শব্দ। সরোজ দত্তের মৃতদেহ পড়ে রইল ময়দানে। সেই অভিনেতা যে কোন কারণেই হোক চলে গেলেন বোম্বেতে। বহুকাল তিনি কলকাতায় আর আসেন নি।" (সত্যযুগ থেকে অংশবিশেষ।)

একটু বেলায় সরোজ দত্তের মৃতদেহ পাওয়া গেল ময়দানে।

পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে গেল কিন্তু কার মৃতদেহ কাউকে জানতে দিল না।

নকশালপন্থীদের কাছে গোপন রইল না ঘটনা। শোনা যায় সেই অভিনেতাকে কিছু সমাজবিরোধী হুমকি দিয়ে বোম্বে যেতে বাধ্য করেছিল। এই সব সমাজবিরোধীরা পুলিশ নিযুক্ত কিনা কে জানে।

সরোজ দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী বেলা দত্তের কানেও খবর পৌঁছেছিল। তিনিও অনুসন্ধান করতে থাকেন কিন্তু পুলিশের খাতায় সরোজ দত্তের নাম ছিল না। নিপুণভাবে আইনকে ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সংসদ সদস্য ভূপেশ গুপ্ত প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন সরোজ দত্তের মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করতে। প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সংগ্রহ করে জানিয়েছিলেন সরোজ দত্তকে পুলিশ কোন সময়ই গ্রেপ্তার করে নি। প্রধানমন্ত্রীর মত ব্যক্তির এমন অসত্যবাদিতা পৃথিবীতে বিরল।

তবে কি সরোজ দত্ত হাওয়াতে মিলিয়ে গেছেন।

তাঁর সহকর্মী আর খ্যাতনামা অভিনেতা এর জবাব দিতে পারবেন।

সরোজ দত্ত হারিয়ে গেলেন।

তারমত আরও কয়েকশত হারিয়ে গেছেন। তাদের হিসাব করার লোক আর কেউ নেই।

শাহ আলম আর ফেরেননি। হারিয়ে গেছেন। তবে কথানা হাড় খুঁজে পেয়েছেন তার বিধবা স্ত্রী।

শাহ আলম আর ফিরে আসেননি।

একাত্তর সালের চোদ্দ সেপ্টেম্বর কাক জ্যোৎস্নায় ঘুম থেকে উঠে শাহআলম বেরিয়েছিলেন পেটের ধান্দায়। আর ফিরলেন না ঘরে। কয়েকদিন বাদে চটের থলেতে বাঁধা তার গলিত মৃতদেহ পাওয়া গেল এক পচা ডোবায়।

তার বাড়ি থেকে সেই পচা ডোবা অনেকটা দূরে।

অনেকের মনেই সন্দেহ, ওটাই কি শাহ আলমের দেহ। তাজা জওয়ান মরদের দেহটা কি কয়েকটুকরো হাড় ও পচা মাংস। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভুল করে নি। ঠিকই সে চিনতে পেরেছিল শাহ আলমকে। সেই হাড়মাংস বুকে করে কেঁদে ডুকরে উঠেছিল তার স্ত্রী।

শাহ আলম মোল্লার বাড়ি ছিল সোনারপুরের পোলঘাটে। বাড়ি তো নয়, মাথা গোঁজার মত একটা যেমন তেমন আস্তানা গরীবের সংসার। অভাব নিত্য দিনের সাথী। অর্ধেক দিনই হেঁসেলে ধোঁয়া উঠে না। হাঁড়ি চড়ে না প্রায়ই। শাহ আলমের ঘরে বুড়ো বাবা মমতাজ আলম। স্ত্রী আর একটি দুমাসের ছেলে। এ ছাড়া ছিল এক বেকার ভাই। সদাই হাসি খুশি, ছটফটে ছেলেটা ছিল প্রাণ সম্পদে পূর্ণ। আপদে বিপদে পোলঘাটের গরীব গুবরো মানুষগুলো ছুটে আসত তার কাছে। পরামর্শের জন্য শাহ আলমকে, কোথায় ক্ষেত মজুররা মজুরী পাচ্ছে না, ডাক শাহ আলমকে, পুলিশ জোর জবরদস্তি করে ধরে নিয়েগেছে গরীব গ্রামবাসীদের শাহ আলম সবার আগে ছুটে গেছে থানার, জুলুমবাজির প্রতিবাদ জানিয়েছে। যুব কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের নয়া বর্গীরদল হামলা করেছে মানুষের ওপর। শাহ আলম সোচ্চার হয়েছে প্রতিবাদে। গ্রামের মানুষকে এককাট্টা করেছে

প্রতিরোধে। এক কথায় শাহ আলম ছিল পোলঘাটের প্রাণ, গ্রামের মানুষের আত্মার আত্মীয়। তিরিশ বছর বয়সেই সে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মন জয় করেছিল। রাজনীতিক জীবনে সে ছিল সি. পি. আই (এম)-এর সদস্য, পোলঘাট অঞ্চল কৃষক সমিতির সম্পাদক।

স্বাভাবিক ভাবেই শাহ আলম জোতদারদের চক্ষুশূল ছিল। কংগ্রেস আর তার অনুচর দলটির একাংশের স্থানীয় গুণ্ডাদের সব দুষ্কার্যের পথে কাঁটা ছিল সে। তাই তারাও সহ্য করতে পারত না শাহ আলমকে। আর পুলিশ? তারা তো বারে বারে জঘন্য অত্যাচার করেছে সর্বজন প্রিয় এই কৃষক কর্মীটির ওপর। এমনকি তারা শাহ আলমের বুড়ো বাবাকেও রেহাই দেয়নি। রেহাই দেয়নি তার স্ত্রীকে। খুন হবার নয় মাস আগে পুলিশ হঠাৎ একদিন তার বাড়ি চড়াও হয়। সঙ্গে কংগ্রেস আর সি-পি-আই-এর ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী। পুলিশের চোখের ওপর গুণ্ডারা শাহ আলমকে আক্রমণ করল। প্রচণ্ড মারধোর করে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে বীরদর্পে চলে গেল। আর পুলিশ? গুণ্ডারা চলে যাবার পর শুরু হল তাদের বীরত্ব। তারা আহত শাহ আলমকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল থানায়। ন'মাসের গর্ভবতী স্ত্রীও রেহাই পেলেন না। সিদ্ধার্থ রায়ের 'শান্তি রক্ষকের দল' তাঁকেও চূড়ান্ত লাঞ্ছনায় পর থানায় হাজির করল। মিথ্যা মামলায় শাহ আলমকে জড়াবার চেষ্টা হল। কিন্তু এত হামলা, নির্যাতন, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও শাহ আলম দল ছাড়ল না। ছাড়ল না কৃষক সমিতি।

"অতএব।

"রাতের অন্ধকারে পোলঘাটের জোতদার ইলিয়াস আলি মোল্লার চার কুটুরিতে শুরু হয়ে গেল শলা পরামর্শ। আর নয়। এবার একেবারে খতম করতে হবে শালাকে।

"অবশেষে এল সেই কাল রাত্রি। চোদ্দই সেপ্টেম্বর। সেদিন ভোরবেলায় শাহ আলম বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। আগের রাত থেকে ঘরের একটি প্রাণীও মুখে কিছু দেয় নি। এমন কি

দুগ্ধপোষ্য শিশুটাও একফোঁটা দুধ পর্যন্ত পায়নি। দুধের শিশু, সদ্য প্রসূতি স্ত্রী, বুড়ো বাবা সকলেই অনাহারে। সকলেই তাকিয়ে ছিল শাহ আলমের দিকে। কিন্তু কি করবে সে? পকেটে একটাও পয়সা নেই। কি দিয়ে এতগুলো মানুষের পেটের জ্বালা মেটাবে?

"তবুও শাহ আলম সেই সাত সকালে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে যদি দু মুঠো খাবার আনা যায়। শাহ আলম ঘুরল এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে। শুধু নিজের ধান্দায় নয়, পার্টির কাজ, কৃষকসভার কাজ, সব সেরে সন্ধ্যা নাগাদ সে ঘরমুখো হল। ইতিমধ্যে বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে শাহ আলম আধ কিলোটেক আটা কিনে নিয়েছে। আর কিছু হোক আর না হোক আটা গুলেও তো ছেলেটার মুখে দেওয়া যাবে, দুখানা রুটিও তো বিবি বাপজানের পাতে পড়বে। কিন্তু বেচারা শাহ আলম জানত না কি ভীষণ পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে বাড়ির কাছ বরাবর চলে এসেছে। পথ অন্ধকার। নির্জনও বটে। একটু জোরেই পা চালাচ্ছিল শাহ আলম। হঠাৎ রাস্তার ধার থেকে আশস্যাওড়ার ঝোপ ঠেলে এগিয়ে এল জনা ছয়েক নরপিশাচ। চিৎকার করে উঠেছিল শাহ আলম। বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল প্রাণপণ। কিন্তু অতোগুলো লোকের সঙ্গে একা সে খালি হাতে কতক্ষণ যুঝবে! খুনীর দল শাহ আলমকে পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল পাশেই খালের ধারে। খালে নৌকা ছিল। শাহ আলমকে তোলা হল নৌকায়। তাকে পাটাতনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হোল তারপর ছেড়ে দিল নৌকা। রাস্তার ওপর জলে কাদায় পড়ে রইল সেই আটার ঠোঙা। পোলঘাটের একান্তে ঘরের কোণে অপেক্ষা করে আছে শাহ আলমের রুগ্না স্ত্রী, বুড়ো বাবা, বেকার ভাই। আর শিশু পুত্রটি? সে বুঝতেই পারল না কি সর্বনাশ ঘটে গেল।

"খুনে বাহিনীর নৌকা এসে ভিড়ল বন হুগলীতে। শাহ আলমকে

তারা টুকরো টুকরো করে কাটল ওখানে। তারপর একটা চটের থলেতে খণ্ড বিখণ্ড দেহটাকে পুরে খালের ধারে ঘন কচুরি পানায় ঢাকা একটা ডোবায় ফেলে দিয়ে এল।

"শাহ আলমের বাবা, স্ত্রী ভাই সবাই সারা রাত অপেক্ষা করল। কিন্তু সে আর ফিরল না। তখনও তারা জানত না যে তাদের শাহ আলম আর কোন দিন ফিরবে না। মমতাজ আলম পরের দিন অর্থাৎ পনরই সেপটেম্বর সোনারপুর থানায় ছুটে গেলেন। কেঁদে পড়লেন দারোগার পায়ে। "আমার ছেলে খুঁজে এনে দিন। তাকে ফিরিয়ে এনে দিন।" কিন্তু পুলিশ মমতাজ আলমের ডায়েরী নিল না। তার ওপর দু ঘণ্টা ধরে চালানো হল অকথ্য নির্যাতন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, সত্তর বছরের বুড়োর বুকের ওপর বারে বারে বুটশুদ্ধ লাথি মারা হয়েছে। পৈশাচিক উল্লাসে তার বুকের ওপর চেপে নাচানাচি করা হয়েছে। হাতের আঙ্গুলগুলো মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তারপর মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সুবিবেচক। ছেলের শোচনীয় মৃত্যুর মারাত্মক যন্ত্রণা বেশিদিন ভোগ করতে হল না। পুলিশী নির্যাতনের পরিণতিতেই কিছুদিন পরে মমতাজ আলম কবরে গেল।"

(সত্যযুগ-৫. ৫. ৭৭)

শাহ আলম হারিয়ে গেল চিরকালের মত।

এমনিধারা হারিয়ে গেছে শতশত যুবক যুবতী। এদেরই আর-একজন হল তপন বসু।

দিনটা ছিল একাত্তর সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর।

বছরটা বিদায় চায়।

শীতটাও বেশ জমাট।

সকালের মিঠে রোদে পথে বেরিয়েছে দুজন তরুণ। সামনে তাদের পরীক্ষা। সাতদিন বাদেই পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার বিষয় আলোচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

সঙ্গী বাবলুর প্রস্তাবে তারা চলল আরেক বন্ধুর বাড়িতে সাজেশানের আশায়।

হঠাৎ এক পুলিশ বাহিনী এসে চিৎকার করে হুকুম করল, হল্ট। পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন যাদবপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টার মোহান্তি। আর তার সাথে ছিল এলাকার কুখ্যাত এক কংগ্রেসী সমাজবিরোধী! কানা অজিত নামে সারা যাদবপুর তল্লাটের লোক একে চেনে। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই আবার হুকুম হল হাত তুলে দাঁড়াও। ওরা হাত তুলে দাঁড়াতেই পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তপনের উপর। বাবলুকে ওরা ছেড়ে দিল।

এই তপনও হারিয়ে গেল।

তপনকে টেনে তুলল পুলিশের গাড়িতে।

গাড়ি দাঁড়াল বোড়াল যক্ষা হাসপাতালের পাশে একটি প্রায় জনহীন স্থানে। 'মোহান্তির আদেশে তপনকে দাঁড় করিয়ে পুলিশের রাইফেল গর্জে উঠল। পরপর দুটি গুলি। "দক্ষ শিকারীর অব্যর্থ নিশানা লক্ষভ্রষ্ট হল না। তপনের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর পুলিশের একটি ট্রাকে চড়িয়ে ওরা কোথায় গেল কে জানে।"

চিরতরে তপন হারিয়ে গেল।

ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়ে লেখা রয়েছে তপনের বাবা আশুতোষ বসুর কাহিনী। ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে আশুবাবু পুলিশের হাতে বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। বহুকাল কারাগারে বাস করেছেন। আশা ছিল, ইংরেজ বিতাড়িত হলে, দেশ স্বাধীন হলে ভারতের মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করবে। দেশপ্রেমী এই ভদ্রলোক সর্বস্ব হারিয়েছেন দেশমাতৃকার সেবা করতে। শেষ হারালেন তার তরুণ পুত্রকে। আশুবাবু বোধহয় চিতোর দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 'মঁ্যা ভুখা হুঁ' নির্দেশের অপেক্ষা করেছেন এতকাল। পুত্রের রক্ত দিয়ে দেশসেবার শেষ নিদর্শন

এঁকে দিলেন ভারতের স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রীর অভিনব গণতন্ত্রকে। আর তার পুত্রের রক্তে ঋণশোধ করলেন সেই সব পাপাত্মার যারা ইংরেজ রাজত্ব কায়েম রাখতে তার ওপর অত্যাচার অবিচার করেছিল।

আশুবাবু জানেন, তার ঋণ শোধ হয়েছে।

তপনকে গ্রেপ্তার করার সংবাদ পেয়ে আশুবাবু তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ ছুটে গেলেন থানায়। দেখা করলেন মোহান্তির সঙ্গে। জানতে চাইলেন কি অপরাধ তার পুত্রের।

হায় আশুবাবু। আপনি কি ভুলে গেছেন বাংলাদেশের যৌবন হল অভিশপ্ত। ইংরেজ আমলেও যুবকরা নিগৃহীত হয়েছে পুলিশের হাতে, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বৈরাচারীর শাসনেও বাংলার যুবজীবন নিগৃহীত হচ্ছে পুলিশের হাতে। এটাই তো ভাগ্যলিপি। যারা যুব সমাজকে কাজ দিতে পারে না, আহার্য দিতে পারে না, তারাই তো নানা কৌশল প্রয়োগ করেও যখন দেখছে অন্যায় ও জুলুমবাজির প্রতিবাদ করার মত মানুষ জন্মাচ্ছে ঘরে ঘরে তখন রাইফেল ব্যবহার করছে। ভীতি সৃষ্টি করে ভক্তি আনার জন্য দুঃসাহসিক ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

মোহান্তি আশুবাবুর প্রশ্নের জবাব দেন নি। বরং অপমান করে বিদায় দিলেন। মোহান্তি বোধহয় মনে করেছিল তাদের মত কাপুরুষ পুলিশরাই দেশের স্বাধীনতা এনেছে। যারা অসহায় নিরস্ত্র তপণকে বিনা অপরাধে হত্যা করে তাদের মত কাপুরুষ ও ঘৃণ্য কে থাকতে পারে। যারা সব দিয়েছে দেশের জন্য তাদের শাসন করতেই তো কংগ্রেসী পুলিশ। হতভাগ্য দেশ।

আশুবাবু ঘাতকদের কাছে কৈফিয়ত দাবী করেছেন, স্পর্দ্ধাতো কম নয়। পুলিশকে শক্তিশালী করেছে প্রধানমন্ত্রী আর তার স্তাবকরা। তাদের কাছে কৈফিয়ত চায় কিনা একটা petty old man, মানুষ বাঁচাবার ক্ষমতা না থাকলেও মানুষ মারার ক্ষমতা তো তাদের আছে।

তবে মোহান্তি একেবারে বোবা নন। তিনি খেঁকিয়ে উঠে বলেছিলেন, পুলিশ কি করবে আর না করবে তা কি আপনার পরামর্শ মত ঠিক করবে।

"বুক ভরা এক বোবা কান্না নিয়ে ফিরে এলেন তপনের বাবা ও মা।

"চারিদিকে ভীতির আবহাওয়া। যাদের ঘরে জওয়ান ছেলে রয়েছে তারা ভীত হলেন। যে কোন সময় পুলিশ যাকে তাকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করতে পারে, তা না হলে সমাজবিরোধীদের হাতে তুলে দিতে পারে। ভয়ে কেউ আর কথা বলতে চায় না। সবাইয়ের ঘরেই জওয়ান ছেলে, সবাইয়ের ভয়।

"সন্ত্রাসের রাজ্যে বাস করেছে যাদবপুরের মানুষ সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর।

"সত্যই তপনকে পুলিশ হত্যা করেছে এমন প্রমাণ আছে কি?

"আশুবাবু বলেন, নিশ্চয়ই আছে। ঘটনা স্থলের আশেপাশে যারা ছিলেন তাদের কেউ কেউ স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখেছেন। তখন তারা কেউ ভয়ে মুখ খুলতে পারেন নি। আজ যদি কোন নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হয় আমি নিশ্চয়ই প্রমাণ করে দিতে পারব যে পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে।" (সত্যযুগ)

তপনের মা আজও কাঁদেন। অনুশোচনা করেন, ছয় বছর আগে আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে তাদের আজও তো কোন বিচার হয়নি।

না হয় নি। কোন দিন হবে কিনা সন্দেহ। বরং ঘাতক প্রমোশন পাবে। যতই দাবী করুক সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ তার মোটেই 'মায়ের অশ্রু মোচনে সাহায্য করবে না। জমানা বদল হয়েছে, কিন্তু কোন জমানায় সমাজ এসে দাঁড়িয়েছে তা এখনও স্থির ভাবে জানা যায় নি।

হারিয়ে গেছে কেরালার রাজন।

ইনজিনিয়ারিং-এর ছাত্র।

তাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তারপর থেকে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি তার। এতো একটি মাত্র ঘটনা।

পশ্চিম বাংলার শত শত রাজন হারিয়ে গেছে, তাদের জন্য তো বিশেষ কোন উদ্বেগ নেই বর্তমান শাসককুলের।

সন্ধ্যা কর্মকার লিখেছেন, সম্প্রতি কেরালার ছাত্র পি-রাজন নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপার নিয়ে গোটা দেশে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অতি সম্প্রতি নির্বাচিত কেরালার মুখ্যমন্ত্রীকে এর জন্য পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় গত, পাঁচ ছয় বছর ধরে এরকম বহু ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন যাদের আজ পর্যন্ত কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। আমারই ভাই শ্রীরবীন কর্মকার এদেরই একজন।

আমার ভাই নকশাল আন্দোলনে যুক্ত. এই অভিযোগে পুলিশ প্রায়ই আমাদের বাড়িতে তার খোঁজে তল্লাসী চালাত। একদিন ওকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমার আর এক ভাই যে কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না তাকে ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর অবশ্য এই ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার যে ভাই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল ও পুলিশ যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল সে সাতই নভেম্বর ১৯৭১ থেকে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যায় এবং এরপর থেকে পুলিশও তার সম্পর্কে আর কোন তল্লাসী চালায় না। আমার আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পশ্চিম বাংলার আর বহু নকশাল যুবকের মতোই আমার ভাইকেও হত্যা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন কিছু বলা বা লেখার উপায় ছিল না। আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ সুযোগ পেয়েছি বলেই ঘটনাটি জনসমক্ষে প্রকাশ করলাম। আমি চাই আমার এই নিখোঁজ ভাইয়ের হদিশ করা হোক।

দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

বারাসত গণহত্যা সম্পর্কে আংশিক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ঐ গণহত্যার অন্যতম বলি ছিল শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। আমি তার অভাগিনী মা। দিল্লী গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সব কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয় নি। ১৯৭০ সালের ২০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কে-সি-পন্থ তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের নাম তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষিত হয় কিন্তু পরদিন ভোরে তিনি বালিগঞ্জ লেকে ছুরিকাহত হন। ঈশ্বরের দয়ায় তিনি বেঁচে যান। কিন্তু তদন্ত করতে অস্বীকৃত হন। তাই তদন্তের প্রস্তাব আজও কার্যকর হয়নি। তদন্তের দাবি আবার উঠুক জোরালোভাবে। এ-বিষয়ে তদন্ত হলে আমি আমার জানা যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করব।

মানসী চক্রবর্তী উত্তরপাড়া থেকে লিখেছেন,

আমি একজন বিচারাধীন বন্দীর মা। আমার বক্তব্য যদিও অসাধারণ নয় তবুও আপনার পত্রিকায় প্রকাশ হবার আশা রাখি। বর্তমান সরকার নিশ্চয় জানেন কয়েক হাজারের বেশি যুবশক্তিকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে এখনো অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। যে স্বৈরাচার নির্বিচারে মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে—গোটা দেশকে পরিণত করতে চেয়েছে জেলখানায়, নির্জীব করেছে গোটা জাতটাকে, তাদের প্রতিও যখন বর্তমান সরকারের ক্ষমার দৃষ্টি, তখন যে যুবশক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিল, জীবনপণ সংকল্প নিয়ে স্বৈরাচারের উচ্ছেদ চেয়েছিল—পথ যাই হোক না কেন, জনতা সরকারের করুণা কি তাদের ওপর বর্ষিত হবে না? অনেক আশা নিয়েছিলাম, কিন্তু আদালতের শ্লথ গতিতে আশাভঙ্গের বেদনা দেখা দিয়েছে। বুঝে উঠতে পারছি না,

নির্বাচনী শ্লোগান অনুযায়ী সত্যিই কি আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরের আলো দেখতে পাবে, না কি সেটা ছিল শুধু কথার কথা।

উপরের তিনজনের বক্তব্য বড়ই স্পষ্ট।

শ্রীমতী দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় তদন্ত কমিশনের কথা বলেছেন। শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়কে কে ছুরিকাঘাত করল তারও তদন্ত হওয়া দরকার। পুলিশের কুকীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে ভাড়াটে সমাজবিরোধীদের দিয়ে পুলিশ-ই এই কুকার্য করিয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে পুলিশ শত শত যুবক-যুবতীকে হত্যা করেছে, লাঞ্ছিত করেছে তাদের পক্ষে যে কোন হীন কাজ করা অসম্ভব কি? ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন নিরর্থক হবে এটা জানা উচিত ছিল শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের। শ্রীমতী গান্ধীর 'fiight to finish' অনুশাসনেই এই সব ঘটেছে, এটা ভুলে গেলে চলবে না।

শ্রীমতী মানসী চক্রবর্তীর বেদনা সবাই বুঝেছেন কিন্তু এই সরকার বদল মানেই কি সাইনবোর্ড বদল, এটাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে কিনা ভেবে দেখার সময় এখনও হয়নি। ক্ষমতালাভ, দলের স্বার্থ ইত্যাদি নানা ঘোরালো বিষয় জড়িয়ে থাকে সরকার বদলের সঙ্গে। সেজন্য অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে।

হারিয়ে যাওয়া রাজনের কথাটা ধামা চাপা না পড়ে সেজন্য দেশ জোড়া উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু বাংলার শত শত হারিয়ে যাওয়া ছেলের জন্য কোথাও কোন উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে এমন সংবাদ তো শোনা যায় নি।

রাজন আর জোসেফ একই সঙ্গে বন্দী হয়েছিল।

মাত্র এক বছর আগের ঘটনা।

কেরালার শাসন চলছিল সি-পি-আই আর কংগ্রেসের যৌথ ব্যবস্থায়। জোসেফ আর রাজনকে নিয়ে যাওয়া হল গেস্ট হাউসের একটি ঘরে। "এরপর শুরু হয় পুলিশের নির্মম অত্যাচার। রাজনের ওপর প্রথম শুরু হয় আক্রমণ। রাত সাড়ে আটটা অবধি রাজন

ছিল গেস্ট হাউসে। তারপর তাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তিন দিন পরে শুনেছি তাকে পুলিশ গুম করে দিয়েছে।" বলেছেন সহবন্দী জোসেফ চালি।

কেরালা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে রাজনকে আদালতে হাজির করতে। কিন্তু কোথায় রাজন? চিত্রগুপ্তের খাতায় খরচের পৃষ্ঠায় রাজনের নাম হয়ত লেখা হয়েছে, নইলে তাকে হাজির করতে পারছে না কেন কেরালা সরকার আর কেনই বা উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে? অবশ্য এখন স্বীকার করা হয়েছে রাজনকে ২রা মার্চ পিটিয়ে মারা হয়েছে এবং ডি-আই-জি-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু পশ্চিম বাংলার কোন পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি আজও, কেন? এতে কি জনতা সরকারের সমর্থন আছে?

আজ নির্যাতীত মানুষদের জবানবন্দী শোনার অবকাশ পাওয়া গেছে। জোসেফ চালির মুখে শোনা যাক সেই ভয়ঙ্কর পয়লা মার্চের ঘটনা।

"দুপুর নাগাদ শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন। আমার কাছে জানতে চাওয়া হয় নকশাল নেতা সুকুমারন ও মুরালীর খোঁজ। মনোমত উত্তর না পাওয়ায় আমার ওপর চলে রুলারের প্রহার। অবশ্য শুধু আমি নই, রাজনের ভাগ্যেও জুটেছিল এমনি প্রহার। এইভাবে বারে বারে বিভিন্ন জেরার মুখে পড়ে আমাদের ভাগ্যে জুটেছিল যা তা অমানুষিক নির্যাতন। আর সারাদিন আমাদের অভুক্ত রাখা হয়েছিল। এক সময় বেটন প্রহারের চোটে রাজন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। আমারও তখন অনুরূপ অবস্থা হবার জোগাড়।

"পর্যটন আবাসে আমাকে আটই মার্চ পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। প্রথম দিনের পর আর নির্যাতন হয়নি আমায় উপর ঠিকই কিন্তু

আমাকে দেওয়া হয়নি কোন খাবার। অবশ্য আমাকে আর পিটুনি না দেবার কারণ সম্ভবত রাজনের পরিণতির জন্য।

এই সময় পর্যটন আবাসের বাইরে দিন রাত কড়া সশস্ত্র প্রহরী। তাই বাইরে যাবার কোন উপায়ই আমাদের ছিল না। কি কারণে আমাকে আর রাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তা আজও আমি জানি না। আমরা মুরালীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম বলেই বোধহয় পুলিশ এইভাবে নির্যাতন চালিয়েছিল।" (সত্যযুগ ৬।৫।৭৭)

সেম সাইড হয়েছিল শ্যামবাজারে।

আদালতে মামলা করেছিল নিহতদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিন্তু ধোপে-টেকেনি।

পুলিশ কনেস্টবল হয়েও রোয়াকে বসে গল্প করার অপরাধে দুটি ভাইকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। হত্যাকারীদের তালিকায় নাম ছিল উত্তর কলকাতার ডেপুটি কমিশনার ও জোড়াবাগান থানার বড়বাবু। অন্য আরও কজন ছিল কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না পেয়ে আদালত খালাস দিয়েছিল তাদের। যথাযথ প্রমান আনতে পারেনি ফরিয়াদী। পুলিশ এমনই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যার ফলে কেউ সে সময় সাহস পায়নি সাক্ষ্য দেবার।

মৃত্যুর আশঙ্কায় কনেস্টবল ভাই চিৎকার করে বলেছিল, আমাকে মারবেন না স্যার, আমি পুলিশের কনেস্টবল।

হত্যার নেশায় যারা মেতেছে তাদের কানে এই আকুতি পৌছানো সম্ভব নয়। সত্য মিথ্যা বিচার করার ক্ষমতা এই সব জহ্লাদের ছিল না। হয়ত সুস্থ মস্তিস্কেও তারা ছিল না নইলে ঠাণ্ডা মাথায় সন্দেহের বশে তিনজনকে প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে হত্যা করা কি সম্ভব হত?

সেম সাইড গোল দিয়ে বিজয়গর্বে জহ্লাদরা ফিরে গিয়েছিল এরা আজও সশরীরে অধিষ্ঠান; এদের উন্নতিও ঘটেছে কিন্তু যাদের

ঘরের সন্তান এইভাবে জহ্লাদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল তাদের মায়ের অশ্রু মোছাতে কেউ কি তৎপর হয়েছে। হয়ত হয়নি।

ভুলে সেম সাইড হয়েছে, নিরপরাধ যুবককে নামের ভুলে পুলিশ খুন করেছে। এ ঘটনাও বিরল নয়। তবে এসব ভুল ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হবে, যখন রক্তের নেশায় জহ্লাদরা উন্মাদ হয় তখন ভুল ভ্রান্তি স্বেচ্ছায় ঘটায় রক্তের পিপাসা মেটাতে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকিস্থানী খান সেনাদের পাশবিক ও নৃশংস কাণ্ডের সংবাদ ফলাও করে এ দেশের সংবাদ-পত্র সমূহে যখন প্রকাশিত হত তখন মনে গভীর রেখাপাত করত, ব্যথায় বুক ভরে উঠত, ঘৃণায় সর্বশরীর রি-রি করত কিন্তু সেই সব নারকীয় ঘটনার তুলনায় এই সব ঘটনা কি প্রশংসার যোগ্য যুদ্ধকালে অনেক অনাচার বিভিন্ন দেশে ঘটেছে; তার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারও হয়েছে কিন্তু শান্তির সময় কেবল মাত্র ক্ষমতা হারাবার ভয়ে ভারতে যে সব ঘটনা ঘটিয়েছে প্রশাসকরা তা সভ্য সমাজে অস্বাভাবিক এবং অকল্পনীয়। অথচ যারা এ সব ঘটিয়েছে তাদের বিচার করার মত কোন আদালত এ দেশে এখনও গড়ে উঠেনি এখনও। আশ্চর্য নয় কি?

ইহুদী হত্যার জন্য হিটলার ও আইখম্যান যতটা অপরাধী তার চেয়ে কম অপরাধী কি গণতন্ত্রী সমাজবাদী দেশের প্রশাসকরা? এসব চিন্তা করার সময় উপস্থিত। মাই লাইয়ের মত ঘটনাও ঘটেছে এদেশে কিন্তু জনমত একেবারে নিথর কেন? সংবাদপত্রের একটা শ্রেণী এখনও মুখর নয় কেন?

নকুলকাকা একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ক্ষোভে দুঃখে দেহত্যাগ করেছিলেন। মেনকা বউদি কোথায় ভেসে গেছে কে জানে কিন্তু শত শত মেনকা বউদির অশ্রু ও বেদনা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে।

নকুলকাকার মত ভুবন দত্ত আজও খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর পুত্র বিভূতিকে।

কুমারটুলির কুম্ভকারের দল দেবী পূজার বায়না মিটিয়ে বিশ্রাম করছে সে সময়। কেউ কেউ সামনের সরস্বতী পূজার বায়নার আশায় খড়ের বোঁদায় মাটির প্রলেপ দিতে আরম্ভ করেছে, এমন একটা দিনে দুর্ঘটনা ঘটল কুমারটুলিতে।

একাত্তর সালের নবেম্বর মাসের ছয়টা দিন পেরিয়েছে। শীতটাও জমাট বেঁধে এসেছে। বিভূতি শিক্ষকতা করত একটা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অবসর সময়ে চাকুরীর খোঁজে ছুটত ডালহৌসী পাড়ায়। এটা ছিল তার নিত্যকার কাজ। আরেকটি কাজ করত সে, সেটি হল বাবার দেবপূজার জন্য ফুল আনা।

বিভূতি ছিল বিদ্যাসাগর কলেজের কৃতী ছাত্র।

আই-টি-আই থেকে সার্ভেয়ার কোর্স পাশ করেছিল। আশা ছিল শীঘ্রই হয়ত সে একটা ভাল চাকুরীও পাবে।

রাজনীতি?

বিভূতি বলত, আমার কোন নীতি নেই। একমাত্র নীতি হল পয়সা উপায় করে সংসারকে সাহায্য করা।

বন্ধুরা বলত, রাজনীতি বাদ দিয়ে আজকের দিনে কেউ বাঁচতে পারে কি?

আমি দেখিয়ে দেব রাজনীতি বাদ দিয়েও মানুষ বাঁচতে পারে।

সত্যিই বিভূতি রাজনীতি থেকে সাত হাত দূরে থাকত।

কিন্তু কুমারটুলির বেনেটোলার সর্বজন প্রিয় ছিল বিভূতি, লোকের বিপদ আপদে বিভূতি ছুটে যেত। কখনও অসহায় বিধবার মেয়ের বিয়ের জন্য চাঁদা তুলত, কখনও রুগীর পথ্য ও ওষুধ সংগ্রহ করে দিত। গভীর রাতে শবদাহে বিভূতির ডাক পড়ত।

সি-পি-এম, কংগ্রেস ও নকশাল সবাই তাকে ভালবাসত, সমীহ করত। অল্প বয়সে এত বেশি সঞ্চয় কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সেই বিভূতিকে প্রাণ দিতে হল পুলিশের গুলিতে। কেন? আজও এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায় নি। পশু বিশেষ যেমন রক্তের নেশায় পাগল হয় তেমনি কিছু পুলিশ রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিল, তারই পরিণতি।

একাত্তর সালের সেই ভয়ঙ্কর সাতই নবেম্বর।

"রোজকার মত ছাত্র পড়িয়ে বিভূতি বাড়ি ফিরছিল। প্রত্যেক দিন বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির দেব দেবীর পূজোর ফুল কিনে নিয়ে বাবা ভুবনবাবুর হাতে তুলে দিত। ঐদিনও তার নিত্য কাজের ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাতে শোভাবাজার থেকে যথারীতি ফুলের মালা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কয়েকজন বন্ধু তাকে এগিয়ে দিতেও এসেছিল।

বেনেটোলার মোড় সামনে।

মোড় পেরিয়ে তবেই বিভূতির বাড়ি।

আচমকা একটা লাল রং-এর পুলিশ জিপ তাদের পথ রোধ করল।

গাড়ি থেকে উদ্যত রিভলবার হাতে নেমে এসেছিলেন জোড়াবাগান থানার দুইজন পুলিশ অফিসার।

হকচকিয়ে গেল বিভূতি আর তার সঙ্গীরা।

একজন অফিসার ছুটে এসে বিভূতির জামার কলার ধরে জিজ্ঞাসা করল, তোর নাম কি? কোথায় থাকিস?

বিভূতি উত্তর দিল, আমার নাম বিভূতি দত্ত। থাকি এই রাস্তায় কুমারটুলিতে।

নাম শুনেই একজন অফিসার ছুটে গেল লাল জিপের কাছে। জিপের অন্য আরোহীর সঙ্গে কথা বলে তখুনি ফিরে অপর অফিসারকে বলল, স্যার পেয়েছি। এই সেই বেলেঘাটার বিভূতি।

বিভূতি ভীতকণ্ঠে বলল, আমি বেলেঘাটার লোক নই, সেখানে আমি কখনও থাকি নি, থাকি না। আমি শিক্ষকতা করি, শিক্ষকতা করে বাড়ি ফিরছি।

বিভূতির কথা শোনবার প্রয়োজন তাদের ছিল না। পুলিশ তখন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। বিভূতির কথা শেষ হবার আগেই আটটি গুলি বিভূতির বুক-পিঠ বিদীর্ণ করে দিয়েছিল।

লাল জিপ অর্থাৎ থানার বড়বাবুর জিপ। শোনা যায় সে সময় বড়বাবু ছিলেন কোন এক সিং, যার সঙ্গে বাংলার মাটি জলের সম্পর্ক হয়ত অতি ক্ষীণ।

"বিভূতির হাতের ফুলের মালা ছিটকে পড়েছিল রবীন্দ্র সরণীর ট্রাম লাইনের ওপর। নিষ্প্রাণ দেহটাকে পরে এম্বুলেন্স নিয়ে গিয়েছিল ময়না তদন্তের জন্য। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা বিভূতির সঙ্গীদের কাছ থেকে এই পৈশাচিক ঘটনা শুনে উত্তর কলকাতার মানুষ যাঁরা বিভূতিকে জানতেন, তাঁরা সবাই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। এই ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ সত্তর সালের আট-ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে পুলিশের দেওয়া বিভূতির মৃত্যু সংবাদ বেরোল: একদল সমাজবিরোধী গভীর রাতে পুলিশের গাড়িতে হামলা চালায়। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলি চালালে সমাজ-বিরোধীদের মধ্যে বিভূতি নামক একজন যুবক মারা যায়। বিভূতির মৃতদেহ ওর বাবা পান নি। পুলিশের প্রহরায় তার দাহ হয়েছিল। এই মৃত্যু সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে তদন্তের দাবিও তোলা হয়েছিল কিন্তু পুলিশের হুমকিতে বেশিদূর এগোতে কেউ সাহস করেনি।"

ঠিক এমনি ভাবেই রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল অসিত চৌধুরী। কানাই ধর লেনের অসিতের অপরাধ যে কি তা কিন্তু অসিত মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও জানতে পারেনি। পাড়ার লোকে বলে থাকে, অসিতের ভাই ছিল নকশালপন্থী, ভাইয়ের রাজনৈতিক মতবাদের ওজুহাতে অপর ভাইকে প্রাণ দিতে হল। মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায় ভারতেই বিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে এটা সম্ভব। প্রাচীন সভ্যতার দাবীদার ভারতে আইন করে বেগার প্রথা বন্ধ করতে

হয়েছে। পূর্বপুরুষের দশ অথবা বিশ টাকার ঋণ শোধ দিতে বংশ পরম্পরায় বেগার খাটতে হচ্ছে যে দেশে সে দেশে এক ভাইয়ের জন্য অপর ভাইকে যদি পুলিশ হত্যা করে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

শেষ রাতে জিপের শব্দে শুনতে পেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হোস্টেলের মেয়েরা। রাত জেগে তারা পড়াশোনা করছিল। জিপের শব্দে তারা অভ্যস্ত হলেও হঠাৎ জিপটা কেন থামল, তাদের হোস্টেলের সামনে, স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুহল সৃষ্টি করেছিল। জানালা ফাঁক করে তাদেরই কজন তাকিয়ে দেখছিল।

জিপ থেকে নামানো হল একটি যুবককে। পরণে ফুল প্যান্ট, গায়ে হাতওলা গেঞ্জি, পায়ে স্যাণ্ডেল। চারজন যমদূতাকৃতি ব্যক্তি তার সঙ্গে, প্রত্যেকের হাতে রিভলবার। এদের একজন জিপ থেকে একটা থলে বের করে বলের মত কি একটা বের করে ছুড়ে দিল গলির মধ্যে। বিরাট আওয়াজ শোনা গেল। পর মুহূর্তে শোনা গেল গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে যুবকের দেহটা ছিটকে পড়ল ড্রেনের পাশে।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখা মাত্র ছাত্রীরা জানালা বন্ধ করে দিল। একজন ছাত্রী ভয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল, অন্যান্যরা তার মাথায় জল দেবার জন্য ছুটল নীচের তলা থেকে জল আনতে। ইতি-মধ্যে জিপ ছুটে বেরিয়ে গেল পশ্চিম দিকে।

সকাল বেলায় ভীড় জমল মৃতদেহের পাশে। সনাক্ত করতে বিলম্ব ঘটল না। সবাই চিনল, ওপাড়ার অসিত।

ঘাতকদের যে চেহারার কথা জানা গেল তা থেকে সবাই চিনল কে এবং কারা এই ঘাতক। পুলিশের গাড়িতে সমাজ-বিরোধীদের আবির্ভাব নতুন কিছু নয়, কিন্তু পুলিশের সাহচর্যে সমাজবিরোধীরা এই ভাবে নরহত্যা করে দিব্য বহাল তবিয়তে আজও বাস করছে এটাই হল অভিনব ভারতের অভিনব গণতন্ত্র।

অনেক বেলায় পুলিশ এল কুকুর নিয়ে। লোক দেখানো তদন্ত হল। কুকুর যে দিকে ছুটছিল সেদিক থেকে টেনে আনতে হয়রাণ হচ্ছিল ট্রেনার। যদি কুকুরকে যেতে দেওয়া হত, হয়ত পাওয়া যেত ঘাতকের সন্ধান। কিন্তু তা তো হবার নয়। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই 'fight to finish'-এর জেহাদ পালন করছেন, ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জ্ঞাতসারে ও প্রশ্রয়ে এই সব অপকার্য হয়ে চলেছে, অতএব অপরাধীকে খুঁজে পেতে হলে পুলিশকে যেতে হত রাইটার্স বিলডিং-এ যেখানে নরহত্যার ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হয়েছে মন্ত্রীর নির্দেশে।

অসিত চৌধুরী আর ফিরে আসবে না।

তার পিতামাতার ব্যথাবেদনা প্রশমন ঘটবে না কোন কালেই, কিন্তু শেষ রাতে চমকে উঠতে হবে তাদের। কোন এক রাতের শেষ প্রহরে পুলিশ তাদের পুত্রকে গ্রেপ্তার করে সমাজবিরোধীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই অভিশপ্ত রাতের দুঃস্বপ্ন তাঁরা ভুলতে পারবেন না মৃত্যুকাল অবধি।

এতদিন সিদ্ধার্থশঙ্কর ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বাহাত্তর সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস ভোটের বাক্সে ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে নির্বাচনে জিতেছিল।

সত্তর সাল থেকে সমাজবিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে, তাদের বেপরোয়া লুটপাট, খুন জখম ও নারী ধর্ষণের অবাধ অধিকার দিয়ে কংগ্রেসের প্রায় এক শতাব্দীর গরিমাকে কলঙ্কিত করে সিদ্ধার্থশঙ্কর ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। সেই ক্ষমতা সম্প্রসারণের চেষ্টাও চলছিল সঙ্গে সঙ্গে। উৎপীড়িত মানুষের ব্যথা বেদনাকে উপেক্ষা করে, মানুষের সভ্যজীবন যাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং দলীয় ও সমাজবিরোধীদের চাঙ্গা রাখার স্বার্থে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে সিদ্ধার্থশঙ্কর নতুন নজীর সৃষ্টি করলেন।

সিদ্ধার্থশঙ্কর আইন বোঝেন, আইন জানেন কিন্তু ইতিহাস পড়েন নি, রাজনীতির ক-খ শেখেন নি। তাই এই মূঢ়তাই কেবলমাত্র তাঁরই সর্বনাশ ডেকে আনে নি, ডেকে এনেছে তাঁর দলের সর্বনাশ।

ভীতি ও সন্ত্রাস দিয়ে রাজ্য পরিচালনা যারা করতে চায় তারা মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যান। মানুষের ভালবাসা, সম্মতি না পেলে কোন রাজ্যব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। এটা না বুঝেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, না বুঝতেন সিদ্ধার্থশঙ্কর।

ভোটের কারচুপিতে বিধান সভা দখল করা যায় কিন্তু মানুষের হৃদয় দখল করা যায় না। কারচুপির কারসাজিতে একবারই মানুষকে ঠকানো যায়, বহুবার ঠকানো যায় না।

ক্ষমতাকে কায়েম রাখতে প্রয়োজন হল শ্রমিকদের ওপর প্রভাব বিস্তারের।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলো দখল করার মহড়া চলল।

ইউনিয়নের অফিস গুণ্ডা দিয়ে দখল করলেই তো শ্রমিকদের ইউনিয়ন ভাঙ্গা যায় না। নতুন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলল দিবারাত্র। স্থির হল, ইউনিয়নের সভ্যদের স্নায়ুতে আঘাত করতে হলে ইউনিয়নের বাঘা বাঘা নেতাদের শায়েস্তা করতে হবে।

হাতিয়ার প্রস্তুত হল।

প্রধানমন্ত্রী 'মিসা' পাশ করলেন।

আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য মিসা এমন-ই একটা দলিল যা দিয়ে যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সময়ে জেলখানায় ভর্তি করা যায় বিনা বিচারে।

আইন পাশ হবার সময় সংসদের একজন বিরোধী সদস্য বলেছিলেন, অদ্ভুত এবং অশ্রুতপূর্ব ঘটনা ঘটাতে চান প্রধানমন্ত্রী। যদি কোন ব্যক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে বিয়ে করতে অরাজি হন, ইচ্ছা করলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যক্তিকে মিসায় গ্রেপ্তার করতে পারেন।

এমন আইন পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে আছে বলে জানা যায় নি অথচ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রীদেশ বলে খ্যাত ভারতে এমন আইন আছে।

চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর। চিত্তরঞ্জনের পবিত্র নাম বুকে নিয়ে নতুন নগরী গড়ে উঠেছে রেল ইনজিন তৈরীর বৃহত্তম কারখানার জন্য। এই কারখানার শ্রমিকরা কোন মতেই কংগ্রেসকে বরদাস্ত করতে পারেনি। তাদের রয়েছে নিজস্ব ইউনিয়ন।

কংগ্রেস বহু চেষ্টা করেও এই ইউনিয়ন দখল করতে যখন বিফল মনোরথ হল তখন খেল শুরু হল সিদ্ধার্থ রায়ের।

সেই একাত্মী বান মিসা।

১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লেবার ইউনিয়নের আটত্রিশ জন নেতা ও কর্মীর উপর এবং ইউনিয়ন পরিচালিত একটি সংস্থার চারজনের উপর মিসা প্রয়োগ হয়েছে। কয়েকজন হাইকোর্টে মামলা করে মুক্তি পাওয়ার পর আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। বর্তমানে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস-আর-দাস সহ তেরজন এবং এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ স্টোর ও ইন্সটিটিউটের চারজনকে নিয়ে মোট সতর জন ১৯১২ সালের আগষ্ট মাস থেকে বর্ধমান স্পেশ্যাল জেল ও আলিপুর সেনট্রাল জেলে মিসায় আটক রয়েছেন। বাকিরা মুক্তি পেয়েছেন আইনের সাহায্যে। যারা মুক্তি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ এখনও চাকুরি পান নি।

"মিসায় আটক রয়েছেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুহৃদ রঞ্জন দাস। রেলের কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতা এবং এলাকার সবার প্রিয় এই নেতাকে বাইরে রাখা সিদ্ধার্থবাবুরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি বলে ৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনবার তাঁকে মিসায় আটক করেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা পর্যন্ত সাজানো হয়। তাঁকে ৭৫ সালে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর কোয়ার্টারে

আগুন লাগানো হয়। ইউনিয়নের জিপ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আজও তিনি বর্ধমান জেলে আটক রয়েছেন।"

"সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার তবুও ইউনিয়ন ভাঙ্গতে পারেনি। শ্রমিক কর্মচারীদের মনোবল রয়েছে অটুট।" (সত্যযুগ ৭।৫।৭৭)

হাঁ, মিসা।

কিন্তু এমন দিন তো আসতে পারে যেদিন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তাঁর অনুচররাও এই মিসায় আটক হতে পারেন। বুমেরাং তো স্বাভাবিক ধর্ম। এই তো স্বাধীনতালাভের পর ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সিকিউরিটি আইন পাশ করেছিলেন, এই আইনের বড় সমর্থক ছিলেন ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন মন্ত্রী। কালের পরিবর্তনে সুরেশবাবু কংগ্রেস ছাড়লেন; বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের দায়ে সুরেশবাবুকে সিকিউরিটি আইনে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। এমনটা তো প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বেলাতেও তো ঘটতে পারে।

পুলিশের ওপর নির্ভর করে যে সরকারকে বাঁচতে হয় তার দুর্দশার অন্ত থাকে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক পুলিশকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দিতে হয়। আর পুলিশ দেশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে মোটেই দ্বিধা করে না।

নকশালপন্থী সন্দেহে অনেক বিত্তশালী লোকের সন্তানকে গ্রেপ্তার করেছে, প্রচুর টাকার বিনিময়ে এদের অনেককেই ছেড়ে দিয়েছে। যাদের পিতামাতা 'ransom' দিতে রাজি হয় নি তাদের সন্তানদের অনেকেই চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, নইলে নিভৃত-কোনে আটক রয়েছে আজও। শোনা যায় মুক্তিপণের জন্য নানা দেশে মানুষকে চুরি করা হয়। মুক্তিপণ পেলে তাদের মুক্ত করা হয়। নকশালী দমন ব্যবস্থায় 'ransom' আদায় করার বহু ঘটনা ঘটেছে। গোয়েন্দা বিভাগ অথবা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের এবং ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের যে সব কর্মচারী নকশাল দমন করতে

নিযুক্ত হয়েছিল তাদের ব্যক্তিগত নামে ও বেনামের সম্পদ হিসাব, standard of living যাচাই করলেই এর হিসাব পাওয়া যাবে।

মিজানুর রহমান।

এলাহিগঞ্জের শিক্ষিত সমাজসেবী উন্নতমতা যুবক। স্থানীয় জনসাধারণের সর্ব সময়ের বন্ধু। তা হলে কি হবে। স্বার্থসম্পন্ন জোতদাররা তাকে পছন্দ করে না। ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী মিজানুর। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ওপর কোন অত্যাচার হলে মিজানুর প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই কারণেই মিজানুর জোতদারদের চক্ষুশূল।

জোতদাররা চুপ করে বসে থাকেনি।

নদীর ওপারেই লালবাগ শহর, মুর্শিদাবাদ থানা। থানার বাবুদের কাছে জোতদাররা বার বার গেছে পরামর্শ নিতে। যথাযথ বদ পরামর্শ পাবার পীঠস্থান হল কংগ্রেসী সরকার পরিচালিত থানা। শোনা যায়, থানার বাবুরা মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের শিক্ষিত সন্তান। কিন্তু তাদের আচার আচরণে না থাকে ভদ্রতা, না থাকে শিক্ষার অভিমান, না থাকে কর্মজীবনের পবিত্রতা। বয়স্ক বাবুদের চেয়ে তরুণ বাবুরা বোধহয় বেশি নোংরা হয় থানার চেয়ারে বসলে। অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষা রপ্ত করার জন্য পুলিশ ট্রেনিং কলেজে বিশেষ বিশেষ ক্লাশ নেবার ব্যবস্থা আছে কিনা তা বলতে পারবেন একমাত্র পুলিশের উচ্চপদের অফিসাররা। বন্দীর ওপর শারীরিক নির্যাতন করাটা যেন ওদের কাছে নস্যি। এ হেন বাবুরা সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে জোতদারদের অমূল্য অসৎ বুদ্ধি দান যে করবে এটা তো স্বাভাবিক।

বাবুদের পরামর্শে জোতদাররা অকারণে মাঝে মাঝে মিথ্যা ডায়েরী করতে আরম্ভ করল মিজানুরের নামে। এই ভাবে ডায়েরীর পাহাড় জমে উঠল।

রোজই মিজানুর লালবাগ আসে তার পার্টি অফিসে। সোসালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সে দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মী। স্বভাব চরিত্র মধুর এবং সহযোগিতাপূর্ণ।

এমন সময় জঙ্গীপুরে যেতে হল মিজানুরকে পার্টির কাজে। থাকতে হল কয়েকদিন সেখানে। ঠিক এই সময়ে নবাব প্যালেসের পথে ঘটল গুরুতর দুর্ঘটনা। একজন পুলিশ. কনেস্টবল নিহত হল সমাজবিরোধীর ছুরিতে।

পুলিশ সুযোগ পেল।

হত্যাকারীদের সন্ধান করতে সামান্যতম চেষ্টাও তারা করে নি। হয়ত কাগজে কলমে অনেক তদন্তের কথা লেখা হয়েছিল কিন্তু কার্যত কিছুই হয়নি।

জোতদারদের নগদ পয়সা এবার কাজ শুরু করল।

পুলিশ গেল মিজানুরের বাড়ীতে।

মিজানুরের বৃদ্ধ পিতা জানালেন, মিজানুর তো বাড়ি নেই। প্রায় দেড় সপ্তাহ যাবত সে পার্টির কাজে জঙ্গীপুরে গেছে।

এত বড় পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়ে যাবে এটা তো পুলিশ সহ্য করতে পারে না। নিমক খেয়েছে তারা, নিমকহারামী করতে তো পারে না।

যাবার সময় বলে গেল, মিজানুর ফিরে এলে যেন তাকে থানায় যেতে বলা হয়। তার কাছ থেকে কিছু খবরাখবর নেওয়া দরকার।

মিজানুর ফিরে আসতেই তার বৃদ্ধ পিতা থানায় যাবার কথা বললেন।

নিঃসন্দেহে ও বিনা দ্বিধায় মিজানুর গেল থানায়।

থানায় আবোল-তাবোল নানা কথা জিজ্ঞাসা করার পর পুলিশ বলল, তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করলাম।

অবাক হয়ে মিজানুর বলল, আমার অপরাধ?

পুলিশ খুন।

কোন পুলিশ? কবে, কোথায়?

ওসব কথায় দরকার নেই। এই পাহারা, একে হাজতে নিয়ে যাও।

মিজানুর ব্যঙ্গের হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, চমৎকার।

পরের দিন জামিনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করল হাকিম। মিজানুর রয়ে গেল হাজতে। কয়েক মাস পরে মিজানুর জামিন পেল। খুনের মামলার ফাইন্যাল রিপোর্ট দিল তদন্তকারী অফিসার, মিজানুর খালাস পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে আবার পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করল।

মিজানুরকে পুলিশ শায়েস্তা করবে স্থির করেই অপেক্ষা করছিল। লালবাগ শহরের একটা হাঙ্গামা ঘটতেই মিজানুরকে আবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এবার কোন কেসে না দিয়ে সোজাসুজি মিসা।

পরদিনই তাকে পাঠিয়ে দিল বহরমপুর জেলে।

আইন অনুসারে review করার জন্য Board বসল। মিজানুরকে আনা হল কলকাতায় বোর্ডের সামনে। তিনজন বিচারক বসেছেন বিচার করতে।

বিচার এক পক্ষীয়। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পায় না। পুলিশ যে সব কাগজপত্র তৈরী করে তার ওপর নির্ভর করে বিচারকরা অভিমত দেন।

মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ জোতদারদের পাহাড় পরিমাণ মিথ্যা ডায়েরী হাজির করেছিল। তার সঙ্গে পুলিশ খুনের মামলায় সে যে একজন আসামী ছিল তাও বিচারকদের দলিল দস্তাবেজ দিয়ে বুঝিয়েছিল।

মিজানুর আর বিচারকদের হুবহু কথোপকথন (মিজানুর কথিত):

বিচারক: আপনার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে কি?

মিজানুর: মাননীয় বিচারপতি, আমাকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশ

এখানে এনেছে, আমাকে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে, এগুলো কি আইন সম্মত?

বিচারক: হাতকড়া খুলে দিন। আপনি চেয়ারে বসুন।

মিজানুর চেয়ারে বসামাত্র বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, এবার প্রশ্নের জবাব দিন।

মিজানুর: এসব ঘটনা সাজানো। রাজনৈতিক কারণে স্বার্থ-সম্পন্ন জোতদাররা নানা সময়ে অকারণে মিথ্যা ডায়েরী করেছে। এসব ঘটনা আদৌ ঘটেনি, পুলিশও কোন তদন্ত করেনি। এলাহী-গঞ্জ গ্রামের প্রত্যেকটি সৎ লোক এ বিষয় প্রমাণ করবে।

বিচারক: আপনাকে খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কি?

মিজানুর: আজ্ঞে হাঁ। যেদিন খুনের ঘটনা ঘটেছিল তার দশদিন আগে থেকেই আমি পার্টির কাজে জঙ্গীপুরে ছিলাম। ঘটনা ঘটার ছয়দিন পরে আমি বাড়িতে ফিরেছিলাম। জোতদারদের সঙ্গে যোগসাজসে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী জোতদাররা আমাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়েছিল।

বিচারক: লালবাগে তো আপনার মত শত শত যুবক আছে তাদের বিরুদ্ধে তো মিসা প্রয়োগ করা হয়নি, আপনাকেই বা কেন মিসায় গ্রেপ্তার করল?

মিজানুর: বাংলাদেশে শত শত বিচারক তো রয়েছেন, তাদের বাদ দিয়ে আপনাদেরই বা কেন এই বিচার সভায় নিয়োগ করেছে বলুন তো?

বিচারক পুলিশ কর্মচারীকে নির্দেশ দিল, আর প্রয়োজন নেই একে নিয়ে যান।

মিজানুরকে নিয়ে গেল দমদম সেন্ট্রাল জেলে।

পরের দিনই মিজানুর জানতে পারল তার মিসা মাননীয় বিচারপতিরা confirm করেছেন। অতএব অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাকে বন্দী থাকতে হবে।

দমদম থেকে বহরমপুর।

বহরমপুরে নকশাল বন্দীদের সঙ্গে রইল মিজানুর। এখানেও সে পার্টির কাজে নেমে পড়ল। নকশালপন্থীদের এস-ইউ-সির আদর্শ শেখাতে ব্যস্ত হল।

ঘটিবাটি বিক্রি করে মিজানুরের বৃদ্ধ পিতা হাইকোর্টে আবেদন করলেন।

বিচারে খালাস পেল মিজানুর। ফিরে এল নিজের বাড়িতে। তখন তার পিতামাতার অবস্থা সঙ্গীন। দিন গুজরাণ হওয়াই দায়। মিজানুর সবই বুঝল কিন্তু নিরুপায়। তাকে কংগ্রেস সরকার নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে না, এটাই তার বিশ্বাস।

পুলিশের হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা তুলে দেবার মাশুল দিতে হয়েছে রাজনৈতিক কর্মীদের যারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচারী। সেই মাশুল আজও অনেককে দিতে হচ্ছে।

পুলিশের হাতে অসীম ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল সিদ্ধার্থবাবু। আর পুলিশ নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে কিংবা কংগ্রেসের স্থানীয় গোষ্ঠী নেতাদের স্বার্থে বহু তরুণ-তরুণীকে আটক করেছে সাজানো মামলায়। কত পরিবারের যে সর্বনাশ করেছে তার পুরো হিসাব পাওয়াই দুঃসাধ্য।

খড়গপুরের আই-বি ইনসপেকটার দ্বিজেন চৌধুরীর প্রকোপ যে কি তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে শুভাশীষ আর তার বাবা বসন্ত দাস।

বসন্তবাবু রেল হাসপাতালের সামান্য বেতনের ড্রেসার। শুভাশীষ তার একমাত্র উপার্জনশীল পুত্র। দ্বিজেন চৌধুরীর নেক নজর পড়ল শুভাশীষের ওপর। দ্বিজেনবাবু শুভাশীষকে ডেকে বললেন, 'পাড়ার নকশাল ছেলেদের খবর তোমাকে দিতে হবে।

শুভাশীষ বলল, ও কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি সারাদিন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ও সব খবর কোথায় পাব।

যতই কাজ কর আমার কাজ তোমাকে করতে হবে। নইলে বিপদে পড়বে।

শুভাশীষ কিছুতেই রাজি হল না।

দ্বিজেনবাবু ধমকে উঠে বললেন, তোমাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি।

তারপরই নাটক আরম্ভ।

ড্রপসিন্ উঠল।

বিরাট একদল পুলিশ নিয়ে দ্বিজেন চৌধুরী ঘেরাও করল শুভাশীষের বাড়ি। তল্লাস করল কিন্তু শুভাশীষকে পেল না।

পুলিশ যে তাকেই গ্রেপ্তার করবে এটা শুভাশীষ বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল দ্বিজেন চৌধুরীর শনি দৃষ্টি থেকে রেহাই নেই তখন সে পালিয়ে গেল খড়গপুর থেকে।

কিন্তু গরীবের সংসার এভাবে তো চলে না।

বসন্তবাবু গেলেন মেদিনীপুরে। ডি-আই-বি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে দায়িত্বশীল অফিসার শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। শ্রীযুক্ত বসু ঘটনাটা বুঝে আশ্বাস দিলেন বসন্তবাবুকে। আশ্বস্ত হয়ে বসন্তবাবু বাড়ি ফিরলেন। শুভাশীষকে খবর দিয়ে আনালেন। শুভাশীষ আবার চাকুরিতে যোগ দিলেন।

বসন্তবাবু লিখিতভাবেই তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

এত বড় সাহস।

দ্বিজেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

আচ্ছা দেখে নেব।

দ্বিজেন চৌধুরী বসন্তবাবুকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, অবিলম্বে পাঁচশত টাকা দিতে হবে। না দিলে বিপদ ঘটবে।

বসন্তবাবু ছাপোষা গরীব মানুষ। অত টাকা দেবেন কোথা থেকে। তিনি রাজি হলেন না। অক্ষমতা জানালেন। উপরন্তু তার ছেলে নির্দোষ। টাকা দেবেন কেন।

বাইশে ডিসেম্বর। শুভাশীষ হাসপাতালের ডিউটি সেরে সবে বাড়িতে এসেছে। দ্বিজেনবাবু বোধহয় ওত পেতেই ছিলেন। সদলবলে এসে বাড়িতে হামলা করলেন। শুভাশীষকে ধরে ঐ বাড়িতেই সকলের সামনেই মারধর করতে লাগল। আর্তনাদ করে শুভাশীষ পড়ে গেল। শুভাশীষের মা ও স্ত্রী দ্বিজেনবাবুর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো কিন্তু দ্বিজেনবাবুর দয়া হল না। অর্ধমৃত শুভাশীষকে চ্যাংদোলা করে মোটরে তুলে মেদিনীপুর নিয়ে যাওয়া হল।

"তারপর অনেক দিন শুভাশীষের কোন খবর নেই। বাবা বসন্তবাবু দরজায় দরজায় ধর্ণা দেন। অনেক খোঁজা খুঁজির পর জানা গেল ওর নামে একটা মামলা সাজিয়ে ওকে বিহারের জামসেদপুর জেলে রাখা হয়েছে। মামলার বিচার হচ্ছে না। শুভাশীষ এখনো জেলে। বসন্তবাবু লিখেছেন, শুভাশীষের শিশুপুত্র দুইটি যখন বাবার খবর জানতে চায় তখন তিনি জবাব দিতে পারেন না। শুভাশীষের স্ত্রীর আর সন্তানসহ এই পরিবারটি এখন অনাহারের মুখে। বসন্তবাবুর প্রশ্ন: এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কি শুভাশীষ মুক্তি পাবে না। ডি-আই-বি ইনস্পেকটার দ্বিজেন চৌধুরীর বিচার কবে হবে?"

এই সে-ই বন্দিনী।

প্রেসিডেন্সী জেলে আটক মহিলাদের অন্যতমা। শ্রীমতী রাজ্যশ্রী, শ্রীমতী মিনাক্ষীর মত অত্যাচারিতা এই মহিলা।

অপরাধ?

শ্রীযুক্তা শান্তিরানী দেবী নিজেও জানেন না।

অন্যান্য সবাই যুবতী হলেও শান্তিরানী বৃদ্ধা। বয়স তাঁর সত্তর

বছর। কিন্তু অত্যাচারের নির্মম রোলার থেকে ইনিও রেহাই পান নি।

কার নির্দেশে এই অত্যাচার।

সাংবাদিকরা যা বলেন :

"আজও বহু নরনারী কারাগারের অন্তরালে দুর্বিসহ জীবনযাপন করেছেন। সিদ্ধার্থ রায়ের নির্দেশে তাঁর পুলিশ বাহিনী সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা আর পনের ষোল বছরের তরুণীকেও রেহাই দেয়নি।"

সাংবাদিকরা একমাত্র সিদ্ধার্থ রায়কে দায়ী করলেও দেশের মানুষ তাতে খুশী নয়। তারা জানে এই সব নারকীয় ঘটনা ঘটেছে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনে। সিদ্ধার্থ রায়ের নির্দেশে আর পুলিশ-বাহিনীর বিশেষ ঘাতক ও পশুসেলের বেতনভুক দ্বিপদ জানোয়ারদের হীন প্রবৃত্তিতে।

চিত্তরঞ্জনের বাসিন্দা শান্তিরানী দেব। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবারের ঐতিহ্য রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগামী চিন্তার। বহু রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তও থেকেছেন এই পরিবারের লোকেরা। শান্তিরানী দেব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন দীর্ঘদিন ধরে। পরবর্তীকালে নকশালপন্থীদের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। নানাভাবে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ত্রুটি করতেন না শান্তিরানী দেব। বয়সে বৃদ্ধা হলে কি হবে, মানসিক শক্তিতে শান্তিরানী অনেককেই হার মানান।

রুগ্ন বৃদ্ধা এই মহিলার ওপর যে পৈশাচিক অত্যাচার হয়েছে তা উত্তরকালে নৃশংসতার ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায় হয়েই থাকবে। যে সব কংগ্রেসী খান সেনাদের নিন্দা করে থাকে, তারাও লজ্জা পাবে এই মহিলার লাঞ্ছনার ঘটনা শুনলে, অবশ্য ইন্দিরা গান্ধীর মতই তার কংগ্রেসের অনুচররা লজ্জাহীন। সেজন্য উত্তরকালের মানুষরা ঘৃণিত কংগ্রেসের কথা স্মরণ করে ধিক্কার দেবে।

অক্টোবর মাস।

শান্তিরাণী অসুস্থ। কোনক্রমে চলাফেরা করতে পারেন।

তাঁকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সেই পুরাতন বর্বর কায়দায় শান্তিরাণীকে ডি-ভি-সি কলোনীর বাসা থেকে দুর্গাপুর কোক ওভেন থানায় নিয়ে এল।

'অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ, বিচার হইয়া গেল।'

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাপুরুষ ও মানসিক দিক থেকে নপুংসক অর্থদাস (অ)শান্তিরক্ষকের কতিপয় অত্যুৎসাহী পশুধর্মী তথা-কথিত বীরপুরুষ এই বৃদ্ধাকেও রেহাই দিল না। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলল থানা হাজতে দিনের পর দিন। গ্রেপ্তার করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করানোর বিধি কে মানে? সব আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শান্তিরাণী দেবকে থানা হাজতে রেখে দেওয়া হল বেশ কয়েকদিন। অবশ্য আইনকে কদলী প্রদর্শন করার পথ পুলিশের অজানা নেই। তারা কাগজে কলমে গ্রেপ্তার হয়ত দেখায় না। এইভাবে কাগজে কলমে গ্রেপ্তার না দেখিয়ে শত শত তরুণকে হত্যা করেছে পুলিশ, বেশ কয়েক শতকে গুম করেছে। এর জন্য সরোজ দত্তের হদিস গোপন থেকেছে, তপন বসু চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। আরও একটি চোরাই পথ সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে। কয়েদীকে হাজির না করেই হাকিমকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া, 'আসামীকে হাজির করা হল'। জানি না, এরূপ দুর্নীতির ও বেআইনী কাজের প্রশ্রয়দাতা কজন হাকিম আছেন, তবে ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে নির্ভীকভাবে কাজ করার অনেক হাঙ্গামা। হাকিমদের পুত্রকন্যারা পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবে না এমন আশঙ্কাও ছিল, সেজন্য পুলিশের বিরুদ্ধাচারণ করতে অনেক হাকিম হয়ত সাহস পান নি।

পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করল শান্তিরাণীর বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে

ব্যর্থ হয়ে পুলিশ তাদের পাশুপত অস্ত্র মিসা প্রয়োগ করল। মিসা বন্দী বৃদ্ধা শান্তিরাণীকে বর্ধমান জেলে রাখা হল। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪-এর মার্চ মাসে তাঁকে সকল জেলের শ্রেষ্ঠ জেল প্রেসিডেন্সী জেলে এনে রাখা হল। অন্ধকার জেলে শান্তিরাণী আজও ধুঁকছে আর মৃত্যুর দিন গুনছে।

শান্তিরাণীর ছেলে জহর দেবকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মাতা ও পুত্র দুজনেই দুটো আলাদা জেলে বন্দী। আর সিদ্ধার্থ রায়ের এমনই শাসন ব্যবস্থা যে, মাতাপুত্রের মধ্যে সংবাদ লেনদেনের পথও বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ।

"সরকার তো প্রায়ই দাবি করে যে প্রত্যেকটি মিসা বন্দীর কেস পর্যালোচনা করার জন্য আছে রিভিউ কমিটি। একটা আপীল বোর্ডও নাকি আছে। শান্তিরাণী বোর্ডের কাছে আপীল করলেন কিন্তু এমনই ব্যবস্থা যে তাঁকে সেই বোর্ডের সামনে হাজির করা হয় না। শান্তিরাণীর আপীল কি হল তাহা সহজেই অনুমেয়। শান্তিরাণী এখনও প্রেসিডেন্সি জেলে। এই বৃদ্ধাকে তার পরিবারবর্গের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ রাখার সুযোগও দেওয়া হয় না। তাঁর ছেলে জহর দেব আজ পাঁচ বছর ধরে জেলে বন্দী আছে। মা ছেলে দুজনে বন্দী থাকা সত্ত্বেও চিঠিপত্রের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারেন না। বিদায় নেবার আগে সিদ্ধার্থ রায় দাবি করে গেছেন মিসা বন্দীরা নাকি মুক্ত। শান্তিরাণী দেব আর তাঁর ছেলে জহর বিনা বিচারে আর কতদিন আটক থাকবে? তাঁদের মুক্ত করে আনার এবং তাদের উপর যারা অন্যায় অত্যাচার চালায় তাদের বিচার করার দাবী প্রতিটি বিবেকবান মানুষের।" (সত্যযুগ—৪।৫।৭৭)

নারীনিগ্রহ বিশারদ সিদ্ধার্থ রায় বিদায় নিয়েছে। যাবার বেলায় আশী কোটি টাকার দান খয়রাতের হিসাব দিয়ে গেছে

এর চেয়ে যদি তার পাপকার্যের প্রায়শ্চিত্য করতে এই সব বন্দিনী ও বন্দীদের মুক্ত করে দিতে পারত তা হলে তার শতশত অপরাধ হয়ত দেশবাসী ক্ষমা করত।

কিন্তু সিদ্ধার্থ রায় তো সে ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায় নি।

কোন একটা সাময়িক পত্রে তার অনুচর আট আনা মন্ত্রীর বিবৃতি বের হবার পর যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল সিদ্ধার্থ রায়। সেই ঘটনা তো আজও মনে আছে অনেকের।

নারীঘটিত অপবাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আদালতের আশ্রয় নেওয়া। সাময়িকপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা ছিল আইন-সম্মত পথ।

সিদ্ধার্থ রায়ের গুণ্ডাবাহিনী প্রস্তুত ছিল।

তারা পিস্তল বোমা নিয়ে ছুটে এল।

যে প্রেসে সাময়িকপত্রটি ছাপা হয় তা ভেঙ্গে তছনছ করে বোমা ফাটিয়ে তাদের প্রভুর নারীঘটিত কলঙ্ক মোচন করে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

এ হেন সিদ্ধার্থ রায় কি করে তার পাপের চিহ্নগুলোকে লোক-সমাজে বের হতে দেবে?

আরও আরও নারী নির্যাতনের কাহিনী রয়েছে কারান্তরালে।

তৃপ্তি সরকার হুগলী জেলার মেয়ে।

তার বাবা শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক পরিবারের একজন বলেই সবাই জানত তৃপ্তিকে। তৃপ্তির দিদিও শিক্ষকতা করতেন।

তৃপ্তি বিজ্ঞানের ছাত্রী এবং ছাত্র আন্দোলনের কর্মী।

পরবর্তীকালে যুক্ত হয় নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঁশবেড়িয়া থেকে তৃপ্তিকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে তখন সে অসুস্থ। গ্রেপ্তার করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মগরা থানায়। সেখানে তার ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। পুলিশ তার বিরুদ্ধে একটি মামলা সাজালো। হুগলী কোর্টে জামিন

পেয়ে তৃপ্তি বাড়ি গেল। কিন্তু পুলিশ ছাড়বে কেন? আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। এবার মোক্ষম দাওয়াই মিসা।

"তৃপ্তির স্বাস্থ্য জেলে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। টি-বি-তে আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কোন ভাল চিকিৎসককেও দেখানো হয়নি। এমন কি ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং রুগ্না বন্দিনীদের জন্য যে আলাদা মেডিক্যাল ডায়েট দেওয়ার কথা প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকারের জেল কর্তৃপক্ষ তৃপ্তিকে তা থেকেও বঞ্চিত রেখেছে। তৃপ্তি এখন মরণাপন্ন। তার স্বামীকে অনেক আগেই থানা লক আপে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এখন এই মেয়েটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতন চলবে। সিদ্ধার্থবাবু বিদায় নেবার পরও কি তৃপ্তির মত মেয়েরা মুক্তি পাবে না?"

ইংরেজ রাজত্বকালে জেলের বন্দীরা নানাভাবে লাঞ্ছিত হত। তাদের কংগ্রেসীদের হাতে যেভাবে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে সে তুলনায় ইংরেজের জেল শতগুণে ভাল ছিল। ইংরেজ সরকার বন্দীদের পেট ভর্তি খেতে দিত। কংগ্রেসী সরকার বন্দীদের পেটভর্তি খেতেও দেয় না। এক বাটি ভাত যার ওজন ষাট থেকে সত্তর গ্রাম এবং পাঁপড়ের মত দুখানা রুটি তৎসহ ডাল নামক বস্তুর জল ও অখাদ্য বাগান চচ্চড়ি এটা হল দুপুরের খাদ্য। রাতের বেলার খাদ্য হল পাঁপড় তুল্য চারখানা রুটি আর জলবৎ ডাল ও ঘ্যাঁট। এই আহার্য খেয়ে বন্দীরা আজও বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্য। এখনও সকলের যে টি-বি হয়নি এটাই জিজ্ঞাস্য!

মায়া রায়চৌধুরীর চোখের জল কে মুছিয়ে দেবে?

তার দুঃখের কাহিনী সেদিন (বেরিয়েছিল সংবাদপত্রে।

আমার বড় ছেলে প্রদীপ রায়চৌধুরী এবং ছোট ছেলে প্রবীর রায়চৌধুরী ১৯৭১ সালের সেপটেমবরে গ্রেপ্তার হয়। প্রদীপ পড়তো শিবপুর বি-ই কলেজে এবং প্রবীর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায়

ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করে জাতীয় বৃত্তি পেয়ে ফিজিকসে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে দুজনের উপরই অমানুষিক অত্যাচার করা হয় যাদবপুর থানায়। প্রদীপ সে অত্যাচার সহ্য করতে পারে নি। ২৯ সেপ্টেম্বর পি-জি হাসপাতালে ইণ্টারন্যাল হেমারেজে মারা গেল। প্রবীর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে কোন প্রকারে বেঁচে উঠে। প্রদীপ এবং প্রবীরের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন চার্জ গঠন করতে সক্ষম না হওয়ায় কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহৃত হয়। তাহলে প্রদীপকে কি বিনা অপরাধে হত্যা করা হল না। এর তদন্ত এবং এই হত্যাকারীদের শাস্তি কি হবে না। ইতিমধ্যে ১ অক্টোবর ১৯১২ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভাঙ্গার ব্যাপারে প্রবীর জড়িয়ে পড়ে। তার পরই ১৯১২-এর মে মাসে হাওড়া জেলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

৫ই এপ্রিল যুগান্তরে দেখলাম তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিচারক শর্মা সরকার গুলি চালানোর জন্য শাস্ত্রী রাম প্রয়াগ সিং এবং নির্মমভাবে বেটন ও লাঠিচার্জের জন্য গোরখ সিং, মিঠু পাঠক, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ সিং, ঘটক ঝা এবং হেড ওয়ার্ডার বলদেও সিংকে দায়ী করেন। জেলার বি. দাসের উপস্থিতিতে এই হত্যাকাণ্ড চলে। তিনিও এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী, কারণ জেলার যদি উদ্যোগী হতেন, এমন পাইকারী প্রহার বন্ধ করার চেষ্টা করতেন তা হলে এই ঘটনায় পাঁচ পাঁচটি প্রাণ অকালে ঝরে যেত না। বিচারকের এই রায় থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, এই হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে আছেন কেউ বা কারা যার বা যাদের মৌখিক আদেশে জেলার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সুষ্ঠুভাবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছেন? হত্যাকারী সে যেই হোক, আইনের চোখে নিশ্চয়ই সকলে সমান অপরাধে অপরাধী—শাস্তি তার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তাই যদি হয় তা হলে হাওড়া জেলে ৩ মে ১৯১২ তারিখে পাঁচজন তরুণকে যারা হত্যা করলো সেই সব খুনীর

শাস্তি হয় না কেন? যখন বিচারক দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন। তবে কি পুলিশ বা জেল কর্তৃপক্ষ খুন করলে সেটা খুন নয়, সাধারণ জনতা খুন করলেই সে খুনীরূপে পরিগণিত হবে?

ঘটনার আরও বিস্তৃত বিবরণ হল: দু'ভাই প্রদীপ আর প্রবীর। রায়চৌধুরী পরিবারের গৌরব। বড় ভাই প্রদীপ, ছোট ভাই প্রবীর। দুজনেই বৃত্তি ছাত্র।